স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

কর্মযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. কর্ম-চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব 2
২. নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় 11
৩. কর্মরহস্য 33
৪. কর্তব্য কি? 45
৫. পরোপকারে নিজেরই উপকার 56
৬. অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ 68
৭. মুক্তি 82
৮. কর্মযোগের আদর্শ 97

১. কর্ম-চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব

কর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'কৃ'-ধাতুর অর্থ 'করা'; যাহা কিছু করা হয়, তাহাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ 'কর্মফল'। দার্শনিকভাবে ব্যবহৃত হইলে কখন কখন উহার অর্থ হয়-সেই-সকল ফল, আমাদের পূর্ব কর্ম যেগুলির কারণ। কিন্তু কর্মযোগে আমাদের 'কর্ম' শব্দটি কেবল 'কাজ' অর্থেই ব্যাবহার করিতে হইবে। মানবজাতির চরম লক্ষ্য-জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই একমাত্র লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। সুখ ও আনন্দ তো শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য-এরূপ মনে করা ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ-মানুষ অজ্ঞের মতো মনে করে, সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। কালে মানুষ বুঝিতে পারে, সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও সুখ উভয়েই তাহার মহান্ শিক্ষক, সে শুভ এবং অশুভ হইতে সমভাবে শিক্ষা পায়। সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের মনের উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এই চিত্রসমষ্টি বা সংস্কার-সমষ্টির ফলকেই আমরা মানুষের 'চরিত্র' বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের প্রবৃত্তি -মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টিমাত্র। দেখিবে, সুখ দুঃখ-দুই-ই সমভাবে তাহার চরিত্রগঠনের উপাদান; চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভাল-মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে-ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে-

মানুষ 'আবিষ্কার করে' (discovers) বা 'আবরণ উন্মোচন করে' (unveils)। মানুষ যাহা 'শিক্ষা করে', প্রকৃতপক্ষে সে উহা 'আবিষ্কার করে' । ' Discover' শব্দটির অর্থ-অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। মানুষ যতপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ-উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার

নিজ মনই সর্বদা তোমার অধ্যায়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-স্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজের মন অধ্যায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতর পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরা আর একভাবে সাজাইয়া উহাদের ভিতর একটি নূতন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিলেন; উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব লৌকিক বা পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, বরং আবৃত থাকে; যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি 'আমরা শিক্ষা করিতেছি', এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবরণ যাঁহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাহার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান; আর যাঁহার ভিতর হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, মনের মধ্যেই সেইরূপ জ্ঞান রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যন ঘর্ষণ-জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্য সম্বন্ধে ও সেইরূপ; যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি, তবে দেখিব, আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি- সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা আমাদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন।

উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত, এই আঘাত-সমষ্টিকেই বলে কর্ম। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বাহির করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে কোন মানসিক বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়, তাহাই কর্ম; 'কর্ম' অবশ্য এখানে উহার ব্যপকতম অর্থে ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করিতেছি। আমি কথা বলিতেছি-ইহা কর্ম। তোমরা শুনিতেছে-তাহাও কর্ম। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছি-ইহা কর্ম, বেড়াইতেছি-কর্ম, কথা কহিতেছি-কর্ম, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা করি, সবই কর্ম। কর্ম আমাদের উপর উহার ছাপ রাখিয়া যাইতেছে।

কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি আমরা সমুদ্রতটে দন্ডায়মান হইয়া শৈলখন্ডের উপর তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনি শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্দ বলিয়া বোধ হয়! কিন্তু তবু আমরা জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি। উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা আমরা শুনিতে পাই না। যখন উহারা একত্র হইয়া প্রবল হয়, তখন আমরা শুনিতে পাই। এইরূপে হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে। কতকগুলি কার্য আমরা বুঝিতে পারি, তাহার আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ধরা দেয়, তাহারা কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না।

অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ-সে কি ভাবে করিতেছে; এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা উপলক্ষ্যে অতি সামান্য লোকও মহত্ত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার।

মানুষকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি সে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, ঐ কেন্দ্রেই উহাদিগকে দ্রবীভূত করিয়া

একাকার করিতেছে, তাহার পর একটি বৃহৎ তরঙ্গাকারে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ একটি কেন্দ্রই প্রকৃত মানুষ, তিনি সর্বশক্তিমান,সর্বজ্ঞ; আর তিনি তাঁহার নিজের দিকে সমগ্র জগৎ আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ-সবই তাঁহার দিকে চলিয়াছে এবং তাঁহার চতুর্দিকে সংলগ্ন হইতেছে। তিনি ঐগুলির মধ্য হইতে 'চরিত্র'-নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়া উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ বাহিরে প্রক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে।

আমরা জগতে যতপ্রকার কার্য দেখিতে পাই, মনুষ্য-সমাজে যতপ্রকার আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কার্য হইতেছে, সবই চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, রণতরী-সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা চরিত্র হইতে উদ্ভূত, চরিত্র আবার কর্মদ্বারা নির্মিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ। প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে-সকল মানব জগতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচন্ড কর্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে ওলট-পালট করিয়া দিতে পারিতেন। ঐ শক্তি তাঁহারা যুগযুগব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মতো প্রবল ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ করা যায় না, আর উহাকে পুরুষানুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারও(hereditary transmission)বলা যায় না; কারণ আমরা জানি তাঁহাদের পিতারা কিরূপ ছিলেন। তাঁহারা যে জগতের হিতের জন্য কখনও কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। যোসেফের ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূত্রধর জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ এখনও জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন। যদি ইহা কেবল পুরুষানুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র সামান্য রাজা-যাঁহাকে হয়তো তাঁহার ভৃত্যেরা পর্যন্ত মানিত না, তিনি কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, যাঁহাকে জগতের অনেক লোক উপাসনা করিতেছে? সূত্রধর ও তাঁহার সন্তান-যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে-এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশানুক্রমিক মতবাদ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয় না। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা

হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য উহা যুগযুগান্তর হইতে ঐ স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। অবশেষে উহা বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্তির আকারে সমাজে আবির্ভূত হইল। এখনও ঐ শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

এই সবই কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপার্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা কখন কখন মনে করিতে পারি, ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে দৃঢ়বিশ্বাসী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সারা জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিতে পারে, এ জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাঁহার নিকট জীবন কষ্টকর ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ কর্মের দ্বারা যাহা উপার্জন করি, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার। একজন নির্বোধ জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহার পুস্তকাগারে পড়িয়া থাকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়িতে পারিবে, এবং এই যোগ্যতা কর্ম হইতে উৎপন্ন। আমরা কিসের অধিকারী বা আমরা কি আয়ত্ত করিতে পারি, আমাদের কর্মই তাহা নিরূপণ করে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমারা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের বর্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইহাই নিশ্চত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাহা হইতে পারি। অতএব আমাদের জানা উচিত কিরূপে কর্ম করিতে হইবে। তোমরা বলিবে, 'কর্ম কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবার প্রয়জন কি? সকলেই তো কোন-না-কোন ভাবে এই জগতে কাজ করিতেছে।' কিন্তু 'শক্তির অনর্থক ক্ষয়' বলিয়া একটি কথা আছে। গীতায় এই কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, 'কর্মযোগের অর্থ কর্মের কৌশল- বিঞ্জানসন্মত প্রণালীতে কর্মানুষ্ঠান।' কর্ম কি করিয়া করিতে হয়- জানিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, সকল কর্মের উদ্দেশ্য-মনের ভিতরে পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ

করা, আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞান আছে। এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার, ঐ মহাশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতস্বরূপ।

মানুষ নানা উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকে। কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য হইতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাহারা যশের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহারা অর্থের জন্য কার্য করে। কেহ প্রভুত্ব চায়, তাহারা প্রভুত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে স্বর্গে যাইতে চায়, তাহারা স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর নিজেদের নাম রাখিয়া যাইতে চায়। চীনদেশের রীতি-
না মরিলে কাহাকেও কোন উপাধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষাকৃত ভাল প্রথা বলিতে হইবে। চীনে কোন লোক খুব ভাল কাজ করিলে তাহার মৃত পিতা বা পিতামহকে কোন সন্মানজনক উপাধি প্রদান করা হয়। কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে। কোন কোন মুসলিম-সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকান্ড সমাধি- মন্দিরে সমাহিত হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কার্য করিয়া থাকে। আমি এমন কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা জানি, যাহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমাধি-মন্দির নির্মিত হইতে থাকে; ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম এবং ঐ সমাধি-মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্যক্তি ততই ধনী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ম করিয়া থাকে; সর্ববিধ অসৎ কার্য করিয়া শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাঁহাদিগকে দিল। তাহারা মনে করে, এরূপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিষ্কার হইল, পাপ সত্ত্বেও তাহারা শাস্তি এড়াইয়া যাইবে। মানুষের কার্য-প্রবৃত্তির বহু উদ্দেশ্যের কয়েকটি মাত্র বলা হইল।

কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহাদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর ; তাঁহারা কর্মের জন্যই কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রাহ্য করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়াই তাঁহারা কর্ম করেন।

আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিদ্রের উপকার ও মনুষ্য-জাতিকে সাহায্য করেন; কারণ তাঁহারা সৎকার্যে বিশ্বাসী, তাঁহারা সদ্‌ভাব ভালবাসেন। নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না; সচরাচর দেখা যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম-যশ হয়। কিন্তু যদি কেহ কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না? হাঁ, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে। নিঃস্বার্থ কর্মেই অধিক লাভ, তবে ইহা অভ্যাস করিবার সহিষ্ণুতা মানুষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা বেশী লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থপরতা-এগুলি শুধু নীতি-সম্বন্ধীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ; কারণ এগুলির মধ্যেই মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ মিনিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্তা-স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্তির ভয় অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কাজ করিতে পারেন, তাঁহার মধ্যে শক্তিমান্ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব কার্যে পরিণত করা কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আমরা উহার মূল্য জানি, জানি উহা কত শুভফলপ্রসু। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ বিকাশ। সমুদয় বর্হিমুখ কার্য অপেক্ষা আত্মসংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ। চতুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাধা না পাইয়া পাহাড়ের ঢালু পথে গড়াইয়া যাইতেছে, অথবা শকটচালক অশ্বগণকে

সংযত করিতেছে-ইহাদের মধ্যে কোনটি অধিকতর শক্তির বিকাশ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উহাদিগকে সংযত করা? একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে, অন্য একটি গোলা দেওয়ালে লাগিয়া বেশী দূরে যাইতে পারে না, কিন্তু এই সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমুদয় বহির্মুখ শক্তি স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, ঐগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমার শক্তি-বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু ঐগুলিকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্ধিত হইবে। এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত হইবে; উহা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মতো চরিত্র সৃষ্টি করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রহস্য জানে না, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি জানে না যে, সে যদি কাজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষা করে,

তবে সমুদয় জগৎ শাসন করিতে পারে। সে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুক, এবং এই অজ্ঞানসুলভ জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক। ঐ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গেলেই সে জগৎ শাসন করিতে পারিবে। অনেক পশু যেমন কয়েক পদ অগ্রে কি আছে, তাহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্প কয়েক বৎসর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমরা যেন একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ-ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহার বাহিরে আর কিছু দেখিবার ধৈর্য আমাদের নাই, এইভাবেই আমরা অসাধু ও দুর্বৃত্ত হইয়া পড়ি। ইহাই আমাদের দুর্বলতা-শক্তিহীনতা।

কিন্তু অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি উচ্চতর উদ্দশ্যে কাজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই-নাম-যশের জন্যই কাজ করুক। প্রত্যেককে-সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং ঐগুলি কি-তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ‘কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়’-ফল যাহা হইবার হউক। ফলের জন্য চিন্তা কর কেন? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময় তোমার প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভ কার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইও না।

কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। তীব্র কর্মশীলতার প্রয়োজন; সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আমরা এক মিনিটও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন-সংগ্রামে একদিকে কর্ম-যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘূর্ণিত, আর একদিকে সব ধীর স্থির; সবই যেন নিবৃত্তি-উন্মুখ, চারিদিকে শান্তিময়-কোনরূপ শব্দ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্তু বৃক্ষপুষ্প পর্বতরাজি-সমন্বিত প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই দুইটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর সমুদ্রের মৎস্য উপরে আসিবামাত্র খন্ডবিখন্ড হইয়া যায়-কারণ জলের প্রবল চাপেই উহা জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যাক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে

আসিবামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার যে-ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনি সংযমের রহস্য বুঝিয়াছেন-আত্মসংযম করিয়াছেন। যানবাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। কর্মযোগের ইহাই আদর্শ। যদি এই অবস্থা লাভ করিতে পারো, তবেই কর্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হইলে।

কিন্তু আমাদিগকে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও অধিক নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ, কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন আমরা সত্যই নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমরা সেই অবস্থা লাভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।

২. নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়

সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত-সংস্কৃত ভাষায় ঐ উপাদান-ত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহ্যজগতে ইহাদের প্রকাশকে আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলতা ও জড়তা বলিতে পারি। তমোগুণের লক্ষণ অন্ধকার বা কর্মশূন্যতা; রজঃ- কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত; আর সত্ত্ব-ঐ দুই গুণের সাম্যাবস্থা।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে। কখন তমঃ প্রবল হইয়া উঠে- আমরা আলস্যপরায়ণ হই, আমরা যেন আর নড়িতে পারি না, নিষ্কর্মা হইয়া যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আবার কখন কখন কর্মশীলতা প্রবল হয়। অন্য সময়ে আবার উভয়ভাবের সাম্য বিরাজ করে ,মনে শান্ত ভাব আসে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে সচরাচর এই উপাদান-ত্রযের কোন একটির প্রাধান্য দেখা যায়। একজন হয়তো কর্মশূন্যতা, আলস্য ও জাড্যলক্ষণান্বিত; অপরের প্রধান লক্ষণ- কর্মশীলতা, শক্তি, মহাশক্তির বিকাশ; আবার কাহারও ভিতর আমরা শান্ত মৃদুমধুর ভাব দেখতে পাই-ইহা ঐ পূর্বোক্ত গুণদ্বয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার সামঞ্জস্য। এইরূপে সমুদয় সৃষ্ট জগতে-পশু উদ্ভিদ্ মানুষ-সকলের মধ্যেই আমরা এই বিভিন্ন শক্তির কম-বেশী প্রকাশ দেখিতে পাই।

এই ত্রিবিধ গুণ বা উপাদানই বিশেষভাবে কর্মযোগের আলোচ্য বিষয়। উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়া কর্মযোগ আমাদিগকে ভালভাবে কর্ম করিতে সাহায্য করে। মানব-সমাজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংগঠন। উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীতে ও বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত। সুনীতি ও কর্তব্য কাহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দেখিতে পাই-ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন। এক দেশে যাহা সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো তাহা সম্পূর্ণ দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ-কোন কোন দেশে জ্ঞাতি-ভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহা অতিশয় নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে

পুরুষ নিজ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিতে পারে, অপর দেশে উহা নীতি-বিরুদ্ধ। কোন দেশে একবার মাত্র বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইরূপে আমরা সদাচারের অন্যান্য বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, তথাপি আমাদের ধারণা-সদাচারের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে।

কর্তব্য-সম্বন্ধেও এইরূপ। কর্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন। কোন দেশে যদি কেহ কার্যবিশেষ না করে, লোকে বলিবে সে অন্যায় করিয়াছে; অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্যগুলি করিলেই লোক বলিবে, সে ঠিক করে নাই। তথাপি আমরা জানি, কর্তব্যের একটি সর্বজনীন ধারণা অবশ্যই আছে।

এইরূপে সমাজ এক শ্রেণীর কার্যবিশেষকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে, অপর এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে এবং ঐরূপ কার্য করিতে হইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি পথ খোলা : অজ্ঞ লোকের পথ-তাহারা মনে করে, সত্যলাভের পথ মাত্র একটি, আর সব পথ ভুল; আর একটি জ্ঞানীদের পথ-তাঁহারা স্বীকার করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথবা অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্তব্য ও সদাচারের ক্রম আছে; জীবনের এক অবস্থায়-এক পরিবেশে যাহা কর্তব্য, অপর অবস্থায়-অন্যরূপ পরিবেশে তাহা কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে না।

উদাহরণ : সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ-অশুভের প্রতিরোধ করিও না, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সমুদয় সমাজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে-আমাদের লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। মাত্র একটি দিন যদি এইরূপ 'অপ্রতিকার নীতি' কার্যে পরিণত করা হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ ধরিবে। তথাপি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে 'অপ্রতিকার'-রূপ উপদেশের সত্যতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহাকে আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কেবল

ঐ মত প্রচার করিলে মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হয়। শুধু তাহাই নয়, উহাতে তাহাদের বোধ হইবে যে, তাহারা সর্বদাই অন্যায় করিতেছে এবং তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে। ইহা তাহাদের দুর্বল করিয়া দিবে, এবং অন্যান্য দুর্বলতা অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইরূপ আত্মগ্লানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে। যে-ব্যক্তি নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য।

আমাদের প্রথম কর্তব্য-নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথমে নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, তাহার কখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিতে পারে না।

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্যায় করা হইল-তাহা নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের কর্তব্য হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে তোমরা অনেকে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া হয়তো আশ্চর্য হইয়াছ; বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং ‘অহিংসাই পরম ধর্ম’ এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে-প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে কাপুরুষ ও কপট বলিয়াছেন। এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রান্ত-দুইটি দেখিতে একই প্রকার। চূড়ান্ত

অস্তি’ ও চূড়ান্ত ‘নাস্তি’ সকল সময়েই সদৃশ। আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতি দ্রুত কম্পনও আমরা দেখিতে পাই না। শব্দ সম্বন্ধেও ঐরূপ; অতি নিম্নগ্রামের শব্দ শোনা যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্দও শোনা যায় না। ‘প্রতিকার’ ও ‘অপ্রতিকার’-এর প্রভেদও এইরূপ। একজন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম; প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছা করিলে সে দুর্নিবার আঘাত হানিতে পারে,

তথাপি সে শুধু যে আঘাত করে না-তাহা নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুর্বলতাবশতঃ 'প্রতিকার' করে না, সে পাপ করিতেছে; সুতরাং এই 'অপ্রতিকার' হইতে সে কোন সুফল অর্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে। বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করিলেন-ইহা প্রকৃত ত্যাগ বটে; কিন্তু যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই-এমন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অতএব এই 'অপ্রতিকার' ও 'আদর্শ প্রেম'-এর কথা বলিবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিতেছি, সেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আগে সযত্নে বুঝিতে হইবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের কাজ করিতেছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, এবং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই করিতেছি। অর্জুনও তাঁহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্যব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। 'স্নেহ-ভালবাসা'-বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কপট বলিতেছেন; 'পন্ডিতের মতো কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতো কাজ করিতেছ; ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।' ১

ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ আদর্শ-তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের সোপানমাত্র। এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য-অশুভের প্রতিরোধ করা। কাজ করিতে হইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে,-যতদুর সাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া আঘাত করিতে হইবে। এই প্রতিকারের শক্তি যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম বা পুণ্যকর্ম।

আমার দেশে একবার একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে পূর্ব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়া জানিতাম, কিছু জানিবার জন্য তাহার কোন আগ্রহ

ছিল না-সে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিল। আমার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঈশ্বরলাভের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে, কি

উপায়ে আমি মুক্ত হইব?' আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পারো কি?' সে বলিল, 'না'। তখন আমি বলিলাম, 'তবে তোমায় মিথ্যা বলিতে শিখিতে হইবে। একটা পশুর মতো বা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবনযাপন করা অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভাল। তুমি অকর্মণ্য; কর্মের অতীত যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করে এবং যাহা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তাহা লাভ কর নাই। তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কাজও করিতে পার না।' অবশ্য যে-লোকটির কথা বলিতেছি, তাহার মতো তামসিক প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আমি তাহার সহিত মজা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করিতে হইলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

আলস্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলতা অর্থে সর্বদাই 'প্রতিরোধ' বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্‌ভাবের প্রতিরোধ কর; যখন তুমি এই কার্যে সফল হইবে, তখন শান্তি আসিবে। এ-কথা বলা অতি সহজ যে, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কোন অমঙ্গলের প্রতিকার করিও না'; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার কি অর্থ দাঁড়ায়, তাহা আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমরা 'অপ্রতিকার'-এর ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসনা দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের ন্যায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে। যথার্থ অপ্রতিকার হইতে প্রাণে যে শান্তি আসে, আমরা তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি; মনে হয়-প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাসনা থাকে, এবং যদি তুমি জানো যে সমগ্র জগৎ ধনলিপ্সু পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়া মনে করে, তবে তুমি হয়তো অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হইবে না, কিন্তু তোমার মন দিবারাত্রি অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে। এরূপ ভাব কপটতা মাত্র, ইহা দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয় না। সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, কিছুদিন পর যখন সংসারে সুখ-দুঃখ-যাহা কিছু আছে ভোগ করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে-তখনই শান্তি

আসিবে। অতএব প্রভুত্ব-লাভের বাসনা এবং অন্য যাহা কিছু বাসনা আছে, সবই পূরণ করিয়া লও; এই-সকল বাসনা পূর্ণ হইলে পর এমন এক সময় আসিবে, যখন জানিতে পারিবে-এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিস। কিন্তু যতদিন না তোমার বাসনা পূর্ণ হইতেছে, যতদিন না তুমি এই ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়া যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আত্মসমর্পণের ও বৈরাগ্যের ভাব লাভ করা অসম্ভব। এই 'প্রশান্তি' সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে ইহা শুনিয়া আসিতেছে, তথাপি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব কম দেখিতে পাই। আমি তো অর্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু আমার জীবনে যথার্থ শান্ত ও প্রতিকারচেষ্টাশূন্য কুড়িজন মানুষ দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

প্রত্যেকেরই কর্তব্য-নিজ নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। অপর

ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়তো জীবনে কখনই পরিণত করা সম্ভব হইবে না। মনে কর-আমরা একটি শিশুকে একেবারে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করিতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মরিয়া যাইবে, নয়তো হাজারে একজন বড়জোর ঐ কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে হামাগুড়ি দিয়া অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবে। সচরাচর আমরা মানুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। কোন সমাজে সকল নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ নয়; তাহাদের আদর্শগুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। ওক্ বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক্ বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার করা আবশ্যক।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম। ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী সৃষ্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য মাত্র। এই কারণে একই আদর্শ দ্বারা সকলকে বিচার করা অথবা সকলের সন্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করা উচিত নয়। এইরূপ কর্মপ্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম সৃষ্টি করে। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ধার্মিক ও সৎ হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। আমাদের কর্তব্য-প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ আদর্শ সত্যের যতটা নিকটবর্তী হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা।

আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধর্মনীতিতে এই তত্বটি স্বীকৃত হইয়াছে; তাঁহাদের শাস্ত্রে ও ধর্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানব-সাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ করিতে হয়, তারপর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হয়; বৃদ্ধাবস্থায় হিন্দু গৃহস্থাশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এবং সর্বশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে বড় নয়। যিনি বিবাহ না করিয়া ধর্মকার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যত মহৎ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত

মহৎ। সিংহাসনে আরূঢ় রাজা যেরূপ মহান্ ও গৌরাবান্বিত, রাস্তার ঐ ঝাড়ুদারও সেইরূপ। রাজাকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাজ করিতে দাও-দেখ তিনি কতটা পারেন। আবার ঝাড়ুদারকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দাও-দেখ, সে-ই বা রাজকার্য কিরূপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যগী মহত্তর, এ-কথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের

উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস- এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে। গৃহস্থ বিবাহ করেন এবং সামাজিক কর্তব্য করিয়া যান; আর সংসারত্যাগীর কর্তব্য-তাঁহার সমুদয় শক্তি কেবল ধর্মের দিকে নিয়োজিত করা; তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা করিবেন এবং ধর্মশিক্ষা দিবেন।

‘মহানির্বাণ-তন্ত্র’ হইতে এই প্রসঙ্গে কিছু পড়িব। ঐগুলি শুনিলে তোমরা বুঝিবে গৃহস্থ হওয়া এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করা অতি কঠিন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।১

-গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহাকে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে, তাঁহার নিজের সমুদয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই তাঁহাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।

কর্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হইতে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অথচ উহাতে নাম-যশ হইল বা না হইল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া-এইটিই এ জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য করিতে পারে, কিন্তু কাহারও স্তুতি- প্রশংসা না চাহিয়া অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়া সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ।।২

-গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন উহা সংগ্রহ না করেন। আর তাঁহাকে

স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ।।৩

১ মহানির্বাণতন্ত্র- ৮। ২৩ ২ ঐ- ৮। ২৪ ৩ ঐ- ৮। ২৫

-মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি।।১

-যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ প্রীত হন; হে পার্বতি, তুমিও তাহার প্রতি প্রীতা হও।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।।
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞায়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে।।২

-পিতামাতার সন্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখন কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সুসন্তান। পিতামাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবে, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর যতক্ষণ না তাঁহারা বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবে না।

মাতরং পিতরং পুৎত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহীন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।।

বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ।।৩

-মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে।

জনন্যা বর্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোহধমস্তান্ পরিত্যজেৎ।।

এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্মো হ্যেষ সনাতন।।৪

-পিতামাতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

ন ভার্যান্তাড়য়েৎ কৃপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেহপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।।
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ।।
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্যং ন দর্শয়েৎ।।

১ ঐ-৮।২৬ ২ ঐ-৮।৩০-৩১ ৩ ঐ-৮।৩৩-৩৪ ৪ ঐ-৮।৩৬-৩৭

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কৃচিদাচরেৎ।।১
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্যা পতিব্রতা।
সর্বো ধর্মঃ কৃতস্তেন্ ভবতি প্রিয় এব সঃ।।২

-ভার্যার প্রতিও গৃহস্থের অনুরূপ কর্তব্য আছে : গৃহী ব্যক্তি পত্নীকে কখনও তাড়না করিবে না, তাঁহাকে সর্বদা মাতৃবৎ পালন করিবে, আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ পত্নী বর্তমানে অন্য স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে স্পর্শ করিবেন না; এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জনে শয়ন বা বাস করিবেন না, স্ত্রীলোকের সন্মুখে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেন, কখনও তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। হে পার্বতি, যে ব্যক্তির উপর পতিব্রতা ভার্যা তুষ্ট থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ করিয়াছেন এবং তিনি তোমার প্রিয়।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ।।
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্ত্রান্ প্রষয়েদ্ গৃহকর্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ।।
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।।৩

-পুত্রকন্যার প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এইরূপ : চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত পুত্রগণকে লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত নানাবিধ সদ্গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দিবে। বিংশতি বর্ষ বয়স হইলে তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে, তারপর আত্মাতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্নপূর্বক শিক্ষা দিতে হইবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

এবংক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী।।
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থো পরিপালয়েৎ।।

যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরের স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ।।৪

১ ঐ-৮।৩৯-৪২ ২ ঐ-৮।৪৪ ৩ ঐ-৮।৪৫-৪৭ ৪ ঐ-৮।৪৮-৫০

-গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সন্তোষ বিধান করিবেন। তারপর গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন করিবেন। হে দেবি! বিত্ত থাকা সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এরূপ আচরণ না করেন, তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে; তিনি লোকসমাজে নিন্দনীয় ও পাপী।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ।।
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু।।১

-গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং অশন-বসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন-এ-সকলই পরিমিত-ভাবে করিবে। গৃহস্থ অকপট, নম্র, বাহিরে অন্তরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হইবে।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।২

-গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শৌর্য বীর্য অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবে।

শত্রুগণকে বীর্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোণে বসিয়া কাঁদিবে না, অপ্রতিকার-বিষয়ক বাজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ

যদি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদশন না করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ।।৩

-নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সন্মান দিবে না এবং সন্মানের যোগ্য ব্যক্তিগণের অবমাননা করিবে না।

অসৎ ব্যক্তিকে সন্মান প্রদর্শন করা গৃহীর কর্তব্য নয়; কারণ তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার যাঁহারা সন্মানের যোগ্য, তাঁহাদিগকে যদি গৃহস্থ সন্মান না করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে মহা অন্যয়।

সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কেশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ।।৪

-একত্রবাস ও সবিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া তবে তাহাদের উপর বিশ্বস করিবে।

গৃহস্থ যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে সেখানে যাইয়া লোকের

১ ঐ-৮।৫১-৫২ ২ ঐ-৮।৫৩ ৩ ঐ-৮।৫৩ ৪ ঐ-৮।৫৪

সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবে না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ।।১

-গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন না : নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, ধর্মজ্ঞ গৃহস্থ তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব করা উচিত নয়। ঐ বিষয় তাঁহার গোপন রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞতা নয়; যদি কেহ এরূপ না করেন, তবে তাঁহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলা যাইতে পারে।

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলম্বন; তিনি প্রধান ধনোপার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোক-যাহারা (বাহিরের) কোন কার্য করে যা-সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি এমন হওয়া উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন যে, তিনি নিজ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতেছেন না। এই কারণে-

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেহপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ।।২

-যদি গৃহস্থ কোন অন্যয় বা নিন্দিত কার্য করিয়া ফেলে অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, যাহাতে সে জানে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইবে, সে-বিষয়ও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে আত্মদোষ-প্রকাশের কোন প্রয়োজন তো নাই-ই, অধিকন্তু উহাতে নিরুৎসাহ আসিয়া তাহাকে যথাযথ কর্তব্য করিতে বাধা দেয়। সে যে অন্যায় করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ভুগিতেই হইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সে ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য, আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে, তাহাকে তো মানুষ

বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে

১ ঐ-৮।৫৬ ২ ঐ-৮।৫৭

হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে।

যদি এই শহরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া ধনী না হইতেন, তাহা হইলে এই সভ্যতা-দরিদ্রালয় ও বড় বড় বাড়ি কোথায় থাকিত?

এক্ষেত্রে অর্থোপার্জন অন্যায় নয়, কারণ ঐ অর্থ বিতরণের জন্য। গৃহস্থই জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকার্যে অর্থব্যয় করা তাঁহার পক্ষে উপাসনা, কারণ যে গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন-সন্ন্যাসী নিজ কুটিরে বসিয়া উপাসনা করিলে উহা যেমন তাঁহার মুক্তিলাভের সহায় হয়-সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে; যেহেতু উভয়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার সবকিছুর উপর ভক্তিভার-প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাবের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র দেখিতেছি।

বিদ্যাধনযশোধর্মান্ যতমান উপার্জয়েৎ
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যা দ্রোহং পরিত্যজেৎ।।১

-গৃহস্থ যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবেন এবং ব্যসন (দ্যূত-ক্রীড়াদি),অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করিবেন।

অনেক সময় লোকে নিজেদের সাধ্যাতীত কার্য প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা করিয়া থাকে। আবার

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টা সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।

তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ।।২

-চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত। অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম করিবে। সকল বিষয়েই 'সময়'-এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক সময় যাহা বিফল হইল, আর এক সময়ে হয়তো তাহাতে প্রচুর সাফল্য লাভ হইল।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ।।৩

-ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের যশ খ্যাপন করিবেন না এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্।।৪

-যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম-গৃহ ও সেতু নির্মাণ করিয়া সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন। বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই-সকল কর্ম করিয়া সেই পদলাভের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন।

১ ঐ, ৮।৫৮ ২ ঐ, ৮।৫৯ ৩ ঐ, ৮।৬২ ৪ ঐ, ৮।৬৩

ইহাই কর্মযোগের এক অংশ-গৃহস্থের কর্তব্য ও কাজকর্ম। উক্ত তন্ত্রগ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়:

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেহপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।।১

-যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত হন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া গৃহস্থের মৃত্যু হয়-যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই পদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের পক্ষে যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহা কর্তব্য নয়; পরন্তু শাস্ত্র কোনটিকেই হীন বা উন্নত বলিতেছেন না। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য রহিয়াছে এবং আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপযোগী কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

এই সমুদয় আলোচনা হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, দুর্বলতামাত্রই সর্বথা ঘৃণ্য ও পরিত্যজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্মের ভিতর-আমাদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর-এই বিশেষ ভাবটি আমি খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে-তাহাতে 'অভয়' শব্দটি বার বার উক্ত হইয়াছে। কোন কিছুকেই ভয় করিও না-ভয় দুর্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মানুষকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া নানা পাপ-কর্মে টানিয়া লয়। সুতরাং জগতের ঘৃণা ও উপহসের দিকে আদৌ লক্ষ না রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

যদি কেহ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া জগতের হিত-চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না; আবার যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান্। এই বিষয়টি আমি একটি গল্প দ্বারা বুঝাইব।

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু-সন্ন্যাসীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে বড়, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্তব্য করিয়া যায় সে-ই বড়?' অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'সন্ন্যাসী বড়'। রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে

বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আসিয়া বলিলেন, 'স্বধর্মপরায়ণ গৃহস্থই বড়'। রাজা তাঁহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইলেন।

১ ঐ, ৮। ৬৭

অবশেষে আসিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী; রাজা তাঁহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হে রাজন্, নিজ নিজ কর্মক্ষত্রে প্রত্যেকেই বড়।' রাজা বলিলেন, 'এ-কথা প্রমাণ করুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হাঁ, আমি প্রমাণ করিব; তবে আসুন, কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকিতে হইবে, তবেই যাহা বলিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।' রাজা সন্মত হইলেন এবং সন্ন্যসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহাসমারোহ-ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যসী ঢাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি এবং ঘোষণাকারীদের চিৎকার শুনিতে পাইলেন। পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে-আর ঢেঁটরা পেটা হইতেছে। রাজা ও সন্ন্যসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, 'এই দেশের রাজকন্যা স্বয়ংবরা হইবেন।'

ভারতের প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্যগণের স্বয়ংবরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে প্রত্যেক রাজকন্যারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ও ধারণা ছিল। কাহারও ভাব-বর যেন পরম সুন্দর হয়, কাহারও আকাঙ্ক্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান্ বরের, কেহ কেহ আবার চান খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সন্মুখীন হইতেন। কখন কখন তাঁহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত; সে রাজপুত্রের গুণাবলী, কি কারণে তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্র-তাহা বর্ণনা করিত। সিংহাসনে সমাসীনা সুসজ্জিতা রাজকন্যাকে সভার চতুর্দিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত; তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের একজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেন, এবং কে কিরূপ গুণবান্ তাহা

শুনিতেন। এইরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিতেন, ‘আগাইয়া চল’; তখন সেই প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীদের দিকে আর কেহ চাহিয়াও দেখিত না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যর মনোমত হইতেন, তবে রাজকন্যা তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই রাজকন্যার স্বামী হইতেন।

যে-দেশে আমাদের পূর্ব-কথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সেই দেশের রাজকন্যর এরূপ স্বয়ংবর-সভা হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন; ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর রাজকন্যাই রাজ্য লাভ করিবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা সুপুরুষকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার মনের মতো সুপুরুষকে পাওয়া যাইতেছিল না। অনেকবার এইরূপ স্বয়ংবর-সভা আহূত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও মনোনীত করিতে পারেন নাই। এই স্বয়ংবরসভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। এই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হইয়াছিল, এবং এই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত হইয়াছিল।

সিংহাসনে সমাসীনা রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাহকগণ তাঁহাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতে লাগিল। রাজকন্যা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ

করিলেন না। এবারেও স্বয়ংবর-সভা পূর্ব পূর্ব বারের মতো ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া সকলই নিরুৎসাহ হইতে লাগিল। এমন সময় এক যুবা সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার রূপের প্রভা দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং সূর্যদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন-কি হইতেছে। রাজকন্যাসহ সেই সিংহাসন তাঁহার নিকটবর্তী হইল। রাজকন্যা সেই পরমরূপবান্ সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থামিতে বলিয়া সন্ন্যাসীর গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যসী মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও বলিতে লাগিলেন, ‘এ কি নির্বুদ্ধিতা! আমি সন্ন্যাসী; আমার পক্ষে বিবাহের অর্থ কি?’ সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না; অতএব তিনি বলিলেন, ‘আমার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাইবে

এবং আমার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য।' এই বলিয়া সন্ন্যাসীর গলায় আবার মালা পরাইয়া দিলেন। 'কি বাজে কথা! আমি বিবাহ করিতে চাই না, তবু এ কি?' বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিলেন, 'হয় আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব, নতুবা মরিব।' রাজকন্যা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুবর্তন করিলেন। তারপর আমাদের সেই অপর সন্ন্যাসী-যিনি রাজাকে সেখানে আনিয়াছিলেন-বলিলেন, 'চলুন রাজা, আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।' এই বলিয়া তাঁহারা অনেকটা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। যে-সন্ন্যাসী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসন্মত হইয়াছিলেন, তিনি রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক ক্রোশ গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিলেন; অপর দুইজনও তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন।

এই যুবা সন্ন্যসী ঐ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন; উহার কোথায় কি আঁকাবাঁকা পথ আছে, সব জানিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইরূপ একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বন হইতে বাহিরে আসিবার পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও অপর সন্ন্যাসীটি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গাঢ়, তাহাতে পথ বাহির করা কঠিন, এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এস, আজ আমরা ইহার তলায় বিশ্রাম করি। প্রভাতে তোমাকে বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিব।'

সেই গাছে এক পাখির বাসা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখি, পক্ষিণী ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত। ছোট পাখিটি নীচের দিকে চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, 'দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন

অতিথি আসিয়াছেন-শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে করিয়া একখন্ড জলন্ত কাঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নিখন্ডে কাঠকুটা দিয়া বেশ আগুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পাখিটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। সে তাহার পত্নীকে বলিল, 'প্রিয়ে আমরা কি করি? ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার মতো কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই; কিন্তু ইঁহারা ক্ষুধার্ত, আর আমরা গৃহস্থ; ঘরে যেকেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমি নিজে যতদূর পারি করিব। ইঁহাদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, 'এঁরা তিনজন রহিয়াছেন, তাঁহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখি! ইহা যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর কর্তব্য-স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমার শরীরও ইঁহাদের জন্য উৎসর্গ করি।' এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং পুড়িয়া মরিয়া গেল। শাবক-তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্যাপ্ত হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'আমাদের পিতামাতা যতদূর সাধ্য করিলেন, কিন্তু তাহাও তো যথেষ্ট হইল না। পিতামাতার কার্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্য; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক'-এই বলিয়া তাহারাও সকলে মিলিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। ঐ তিন ব্যক্তি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্তু পাখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাঁহারা অনাহারে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজা ও সন্ন্যসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন সন্ন্যসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, দেখিলেন তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চান, তবে ঐ পাখিদের মতো প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি সংসার ত্যাগ করিতে চান, তবে ঐ যুবকের মতো হউন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। যদি

গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়া লন, তবে সৌন্দর্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যাহা কর্তব্য, তাহা অপর জনের কর্তব্য নয়।’

৩. কর্মরহস্য

শরীরগত অভাব পূরণ করিয়া অপরকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্তু অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর। যদি এক ঘন্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, অবশ্যই তাহার উপকার করা হইল; যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহা অধিকতর উপকার; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার। একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে; অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। কেবল আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব-বৃত্তি চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা। মানুষকে যিনি পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক। আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিবার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ পুরুষ; কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্মপ্রচেষ্টার প্রকৃত ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছা করিলে তিনি অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি না জাগা পর্যন্ত মানুষের শারীরিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-বিষয়ে সাহায্য। অন্ন-বস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর-প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহৎ, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য, জ্ঞানই জীবন। জীবন যদি অন্ধকারে কাটাইতে হয়-অজ্ঞান ও দুঃখের মধ্য দিয়া চলাই যদি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার পর অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান। অতএব অপরকে স্যহায্য করার বিষয় বিচার করিবার সময় আমরা যেন এই ভ্রমে পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। শারীরিক সাহায্যের স্থান শুধু সর্বশেষে নয়-সর্বনিম্নও, কারণ ইহা স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত হইলে যে কষ্ট পাই, খাইলেই তাহা চলিয়া যায়; কিন্তু ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। দুঃখ তখনই নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন

ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ বা যন্ত্রণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অতএব যাহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন করে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার; তার পর মানসিক উপকার, তার পর শারীরিক।

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ-সমস্যার একমাত্র সমাধান

মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মানুষ পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই জগৎ হইতে দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমরা দাতব্য আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বাভার বদলাইতেছে, ততদিন দঃখ-কষ্ট থাকিবেই থাকিবে।

গীতায় আমরা পুনঃপুনঃ পাঠ করি-আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে হইবে। সকল কর্মই স্বভাবতঃ শুভাশুভ-মিশ্রিত। আমরা এমন কোন কর্ম করিতে পারি না, যাহা দ্বারা কোথাও কিছু না কিছু ভাল হয়, আবার এমন কোন কর্ম হইতে পারে না, যাহা হইতে কোথাও না কোথাও কিছু অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক কর্মই অপরিহার্যভাবে শুভাশুভ-মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে বলিতেছেন। শুভাশুভ উভয়ই নিজ নিজ ফল প্রসব করিবে। শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইবে; কিন্তু এই শুভাশুভ উভয়ই আত্মার বন্ধন। গীতায় ইহার এই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত না হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে পারিবে না। এখন ‘কর্মে অনাসক্তি’ বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার মূলভাব এই : নিরন্তর কর্ম কর,-কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। ‘সংস্কার’ শব্দের প্রায় কাছাকাছি অর্থ ‘সহজাত প্রবণতা’। মনকে যদি একটি হ্রদের সহিত তুলনা করা হয়, তবে বলা যায়-মনের মধ্যে যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু উহা চিত্তের উপর একটা দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবির্ভাব-সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং ঐ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার একত্র নাম-‘সংস্কার’। আমরা যে-কোন কর্ম করি- আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা-চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া যায়; যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনও এত প্রবল থাকে যে, তাহারা অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করিতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। এই মুহূর্তে আমার ‘আমি’ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমার অতীত জীবনের সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে ‘চরিত্র’ বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মন্দ কথা শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐগুলিই অজ্ঞাতসারে তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কারগুলি সর্বদাই কাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং ঐ ব্যক্তি একটি মন্দ লোক হইয়া দাঁড়াইবে-সে ঐরূপ না হইয়া পারে

না। তাহার মনের এই সংস্কার-সমষ্টি মন্দ কাজ করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উৎপন্ন করিবে। এই সংস্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে জোর করিয়া মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয়ে চিন্তা করে এবং ভাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইবে এবং অনুরূপভাবে ঐগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিবে। যখন মানুষ এত বেশী ভাল কাজ করে এবং এত বেশী সৎ চিন্তা করে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও ঐ সকল সংস্কারের সমষ্টি-স্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না, সংস্কারগুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া

আনিবে; সে তখন সৎ সংস্কারগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।

যেমন কূর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভেতরে গুটাইয়া রাখে-তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারো, খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিতে পারো, তথাপি পা ও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলি সংযত হইয়াছে, তাহার চরিত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই সেগুলিকে বহির্মুখী করিতে পারে না। এরূপ নিরন্তর সচ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবর্তিত হওয়ায় সৎকর্ম করিবার প্রবণতা প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমরা ইন্দ্রিয়গুলি (জ্ঞানেন্দিয়ের যন্ত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র) জয় করিতে সমর্থ হই। এভাবেই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে। এরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ; তাহার দ্বারা কোন অন্যায় অশুভ কার্য সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই রাখো না কেন, তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই সৎপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে-মুমুক্ষুত্ব। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল যোগের লক্ষ্য-আত্মার মুক্তি এবং প্রত্যেক যোগই সমভাবে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যানের দ্বারা, খ্রীষ্ট প্রার্থনা দ্বারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, মানুষ কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত; কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝা কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-যেমন অশুভ বন্ধন হইতে, তেমনি শুভ বন্ধন হইতেও মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও শিকল। আমার আঙুলে একটি কাঁটা ফুটিয়াছে, আর একটি কাঁটা দ্বারা ঐ কাঁটাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোলা হইয়া গেলে দুটি কাঁটাই ফেলিয়া দিলাম। দ্বিতীয় কাঁটাটি রাখিবার দরকার নাই, কারণ দুটিই তো কাঁটা! এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বারা ব্যাহত করিতে হইবে। মনের মন্দ সংস্কারগুলি দূরীভূত করিয়া সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে হইবে-যতদিন না যাহা কিছু মন্দ, তাহা প্রায়

অন্তর্হিত হয়, অথবা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মনের এক কোণে বশীভূত ভাবে থাকে; কিন্তু তারপর শুভ সংস্কারগুলিও জয় করিতে হইবে। এরূপে 'আসক্ত' মন ক্রমে 'অনাসক্ত' হইয়া যায়। কর্ম কর, কিন্তু ঐ কর্ম বা চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আসুক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্গ উৎপন্ন হউক, কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে।

ইহা করিবার উপায় কি? আমরা দেখতে পাই, যে কার্যে আমরা আসক্ত হই, তাহারই সংস্কার থাকিয়া যায়। সারা দিনে শত শত ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাকে আমি ভালবাসি। রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্ট মুখগুলির বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু এক মিনিটের জন্য যে-মুখখানি দেখিয়াছিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখানিই আমার মনে ভাসিয়া উঠিল, আর সব মুখগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার বিশেষ আসক্তিবশতঃ অন্যান্য মুখগুলি অপেক্ষা ঐ মুখখানিই আমার মনে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। শারীরিক দিক দিয়া মুখগুলি দেখার কাজ একরূপই, যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি সবগুলির ছবিই আমার অক্ষিজালের(Retina) উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক ঐ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় নাই। বেশির ভাগ মুখ হয়তো সম্পূর্ণ নূতন ছিল; এমন সব নূতন মুখ হয়তো দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে আমি পূর্বে কখন চিন্তাই করি নাই; কিন্তু যে-মুখখানির একবার মাত্র চকিত দর্শন পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তো কত বৎসর ধরিয়া মনে মনে তাহার ছবি আঁকিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত বিষয় জানিতাম, এখন এই নতূন করিয়া দেখায়-মনের শত শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার পড়িয়াছে, ঐ একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সংস্কার ফেলিয়া মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে।

অতএব 'অনাসক্ত' হও, সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলি কর্ম করুক। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না করিতে পারে। তুমি যেন

সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য আসিয়াছ-এইভাবে কর্ম করিয়া যাও। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি, এই সংসার-এ পৃথিবী সেগুলিরেই একটি। সাংখ্যের সেই মহাকাব্য স্মরণ রাখিও 'সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়।'১ আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ

করিতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে-ইহাই প্রয়োজন। যদি সর্বদাই এ-কথা স্মরণ রাখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না; আমরা বুঝিব যে, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তকমাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভ করিবার পর, আমাদের নিকট ঐ গ্রন্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া প্রকৃতির সহিত আমরা নিজেদের মিশাইয়া ফেলিতেছি, ভাবিতেছি আত্মাই প্রকৃতির জন্য। চলিত কথায় আছে, আমরাও মনে করি- মানুষ 'খাবার জন্যই বাঁচে'; 'বাঁচার জন্য যে খায়'-তা নয়। আমরা ক্রমাগত এই ভুল করিতেছি; প্রকৃতিকেই 'আমি' ভাবিয়া উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারই আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে না দিয়া ক্রীতদাসের মতো কর্ম করায়।

এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে প্রভুর মতো কর্ম করিতে হইবে, ক্রীতদাসের মতো নয়। সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু দাসের মতো কর্ম করিও না। সকলে কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন হইতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোক ক্রীতদাসের মতো কর্ম করিয়া থাকে-তাহার ফল দুঃখ; ঐরূপ কর্ম স্বার্থপর। স্বাধীনতার সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর! 'প্রেম' শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে কখনও প্রেম আসিতে পারে না। ক্রীতদাসের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাও, সে বাধ্য হইয়া একটানাভাবে কাজ করিবে, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন ভালবাসা থাকিবে না। এইরূপ আমরাও যখন সাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মতো কাজ করি, আমাদেরও

অন্তরে কোন ভালবাসা থাকে না; আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম নয়। আমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম দাসসুলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য কৃত কিনা, তাহার পরীক্ষা এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাজ করা যায়, তাহাতে সুখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কাজ নাই, যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর-সম্বন্ধ-ইহারা একে তিন। ইহাদের একটি যেখানে আছে, অপরগুলি সেখানে অবশ্য থাকিবে। ইহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ! যখন সেই(নিরপেক্ষ) সত্তা আপেক্ষিকভাবাপন্ন হয়, তখন উহাকে আমরা জগৎরূপে দেখিয়া থাকি। সেই জ্ঞানই আবার জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহূদয়ে সর্ববিধ ভালবাসার ভিত্তিস্বরূপ। অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক অথবা প্রেমাস্পদ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

মনে কর, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালবাসে। সে একাই তাহাকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করিতে চায়; তাহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির মনে ঈর্ষার উদয় হয়। সে চায়-মেয়েটি তাহার কাছে বসুক, তাহার কাছে দাঁড়াক, তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক। সে ঐ মেয়েটির ক্রীতদাস, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া রাখিতে চায়। ইহা ভালবাসা নয়, ইহা একপ্রকার দাসসুলভ অনুরাগের বিকার। ভালবাসার মতো দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ইহা ভালবাসা নয়। উহা ভালবাসা হইতে পারে না, কারণ উহা যন্ত্রণাদায়ক। যদি মেয়েটি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালবাসায় কোন দুখঃকর প্রতিক্রিয়া নাই। ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়া থাকে। ভালবাসিয়া যদি আনন্দ না হয়, তবে উহা ভালবাসা নয়; অন্য কিছুকে আমরা ভালবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামীকে, স্ত্রীকে,পুত্রকন্যাকে, সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভালবাসিতে সমর্থ হইবে

যে, তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে।

---

১ তুলনীয়ঃ সংহতানাং পরার্থত্বাৎ

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহুর্ত কর্ম হইতে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। কর্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন? -জগৎকে ভালবাসি বলিয়া।’১ ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত। প্রকৃত ভালবাসা আমাদিগকে অনাসক্ত করে। যেখানেই দেখিবে আসক্তি-পার্থিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণ, সেখানেই জানিবে উহা প্রাকৃতিক আকর্ষণ, কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্ষণ মাত্র-কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে; আর উহারা পরস্পর খুব নিকটবর্তী হইতে না পরিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব হয়; কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এরূপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভালোবাসা অটুট থাকিবে, উহা বিনষ্ট হইবে না এবং উহা হইতে কখনও কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হইবে না।

এই অনাসক্তি লাভ করা একরূপ সারা জীবনের সাধনা বলিলেও হয়, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলাম এবং মুক্ত হইলাম। তখন আমাদের প্রকৃতিজাত বন্ধন খসিয়া পড়ে এবং আমরা প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের জন্য আর বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না; আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি এবং কর্মের ফলাফল আর গণ্য করি না। কি ফল হইল, কে তখন গ্রাহ্য করে?

শিশুসন্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান চাও?

১ তুলনীয়ঃ গীতা, ৩। ২২-২৪

তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য-ঐখানেই উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা কর, তাহা করিয়া যাও, কিন্তু সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা করিও না। যদি সর্বদা দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পারো, প্রত্যুপকারের কোন আশা না রাখিয়া জগৎকে শুধু দিয়া যাইতে পারো, তবেই সেই কর্ম হইতে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আসিবে না। যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই আসক্তি আসে।

যদি ক্রীতদাসের মতো কাজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, তাহা হইলে প্রভুর ভাবে কাজে করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ আসিয়া থাকে। আমরা অনেক সময় ন্যায়ধর্ম ও নিজ নিজ অধিকারের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই-এ-সংসারে ঐগুলি শিশুসুলভ বাক্যমাত্র। দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে-ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতাপ্রয়োগ চিরকালেই স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। সকল নরনারীই-তাহাদের শক্তি ও সুবিধা যতটা আছে, তাহার যতটা পারে তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। দয়া স্বর্গীয় বস্তু; ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেই দয়াবান্ হইতে হইবে। এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের আধ্যত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক; শুধু তাই নয়, পরিণামে ইহা দুঃখের কারণ হয়। আর এক উপায় আছে, যাহা দ্বারা এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে; যদি আমরা সগুণ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কর্মকে 'উপাসনা' বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল ভগবানে অর্পন করিযা থাকি। এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিলে-আমাদের কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রভূ স্বয়ং সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং তাঁহার আসক্তি নাই। জল যেমন পদ্মপত্র ভিজাইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎপন্ন করিয়া কর্ম তেমনি নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অহং-শূন্য ও অনাসক্ত ব্যক্তি জনপূর্ণ পাপসঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন, তাহাতে তিনি পাপে লিপ্ত হইবেন না।

এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে : কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে পঞ্চপান্ডব এক মহাযজ্ঞ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বস্তু দান করিলেন। সকলেই এ-যজ্ঞের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, জগতে পূর্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই। যজ্ঞশেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধশরীর সোনার মতো রঙ, বাকী অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, 'তোমরা সব মিথ্যাবাদী, ইহা যজ্ঞই নয়।' তাহারা বলিতে লাগিল, 'কি তুমি বলিতেছ-ইহা যজ্ঞই নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে দরিদ্রদিগকে কত ধনরত্ন প্রদত্ত হইয়াছে,

সকলেই ধনবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে? ইহার মতো অদ্ভুত যজ্ঞ আর কেহ কখনও করে নাই।' নকুল বলিল :

শুনুন-এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরীব ছিলেন; শাস্ত্রপ্রচার ও ধর্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিকা। সেই দেশে একদা পর পর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল, গরীব ব্রাহ্মণটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেই পরিবারকে পাঁচ দিন উপবাসে থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দিনে পিতা কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহা চার ভাগ করিলেন। তাঁহারা উহা খাদ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল । পিতা দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে, এক অতিথি দাঁড়াইয়া। ভারতবর্ষে অতিথি বড় পবিত্র ও মাননীয়; সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে 'নারায়ণ' মনে করা হয় এবং তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 'আসুন, মহাশয় আসুন, স্বাগত!' ব্রাহ্মণ অতিথির সন্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছি-এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে আমার জঠরাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল!' তখন ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, 'আমার ভাগও উঁহাকে দিন।' স্বামী বলিলেন, 'না, তা হইবে না।' কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নী জোর করিয়া বলিতে

লাগিলেন, 'এ দরিদ্র অতিথি আমাদের নিকট উপস্থিত, আমরা গৃহস্থ-আমাদের কর্তব্য তাঁহাকে খাওয়ানো, আপনার যখন আর কিছু দিবার নাই, তখন সহধর্মিণীরূপে আমার কর্তব্য তাঁহাকে আমার ভাগ দেওয়া।' এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'আমি এখনও ক্ষুধায় জ্বলিতেছি।' তখন পুত্রটি বলিল, 'আপনি আমার ভাগও গ্রহণ করুন। পুত্রের কর্তব্য-পিতাকে তাঁহার কর্তব্যপালনে সহায়তা করা।' অতিথি তাহারও অংশ খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুত্রবধূও তাঁহার ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে ঐ চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেল। ঐ ছাতুর গুঁড়া কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলাম, তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল; আপনারা সকলে তো ইহা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; আমার ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ সুবর্ণে পরিণত হইল না। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নয়।

ভারত হইতে এরূপ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে; মহৎ ব্যক্তিগণের

সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। নূতন ইংরেজী শিখিবার সময় আমি একটা গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল-কর্তব্যপরায়ণ বালকের গল্প; সে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহার কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বই-এর তিন-চার পৃষ্ঠা ধরিয়া বালকের এই কাজের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব কি আছে? এই গল্প যে কি নীতি শিক্ষা দেয়, কোন হিন্দু বালকই তাহা ধরিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাব-'প্রত্যেকেই নিজের জন্য' শুনিয়া আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি! এদেশে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা নিজেরাই সব ভোগ করে, বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্রদিগের একেবারে ভাসাইয়া দেয়। কোথাও কখনও গৃহস্থের এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

এখন তোমরা বুঝিতেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ-মৃত্যুর সন্মুখীন হইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোক তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না, এবং তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করিও না, বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। যথার্থ ত্যাগীর জীবন অপেক্ষা যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন।

৪. কর্তব্য কি?

কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের জানা আবশ্যক, কর্তব্য কাহাকে বলে। আমাকে যদি কিছু করিতে হয়, তবে প্রথমেই জানিতে হইবে-ইহা আমার কর্তব্য, তবেই তাহা করিতে পারিব। কর্তব্য-জ্ঞান আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাঁহার শাস্ত্র কোরানে যাহা লিখিত আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। হিন্দু বলেন, তাঁহার বেদে যাহা আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। খ্রীষ্টান আবার বলেন, তাঁহার বাইবেলে যাহা আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। সুতরাং আমরা দেখিলাম, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে কর্তব্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন। অন্যান্য সার্বভৌম-ভাববোধক শব্দের ন্যায় 'কর্তব্য' শব্দেরও স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কর্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল জানিয়াই আমরা উহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

যখন আমাদের সন্মুখে কতকগুলি ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই সেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কার্য করিবার জন্য স্বাভাবিক অথবা পূর্বসংস্কার অনুযায়ী ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। কখন মনে হয়, এরূপ অবস্থায় এইভাবে কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অন্য সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইলেও সেভাবে কর্ম করা অন্যায় বলিয়া মনে হয়। সর্বত্রই কর্তব্যের এই সাধারণ ধারণা দেখা যায় যে, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই নিজ বিবেকের আদেশ অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ কোন্ গুণ কর্মকে কর্তব্যে পরিণত করে? যদি একজন খ্রীষ্টান সন্মুখে গোমাংস পাইয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আহার না করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে না দেয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেলা হইয়াছে। কিন্তু একজন হিন্দু যদি ঐরূপ ক্ষেত্রে উহা ভোজন করিতে সাহস করে অথবা অপর হিন্দুকে উহা খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় সমভাবে বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্য পালন করা হইল না। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার হৃদয়ে ঐরূপ ভাব আনিয়া দিবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত দস্যুদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল-যাহাকে

পাইবে, তাহাকেই মারিয়া সর্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য; আর যে যত বেশী লোক মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সধারণতঃ একজন পথে বাহির হইয়া আর একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলে অন্যায় কার্য করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শুধু একজনকে নয়, বিশজনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে সে আমন্দিতই হয় এবং ভাবে-সে অতি সুন্দররূপে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কি করা হইয়াছে, বিচার করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না।

সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া একেবারে অসম্ভব; এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য-এরূপ নির্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে ব্যক্তি(Subjective) বা অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ নির্ণয় করা যইতে পারে। যে-কোন কার্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, তাহাই সৎ কার্য; এবং যে-কোন কার্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায়, তাহা অসৎ কার্য। অধ্যাত্মভাবের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও মহান করে, আর কতকগুলি কার্যের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কার্যের দ্বারা কিরূপ ভাব আসিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তব্য সম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা একবাক্যে স্বীকার করিয়া। লইয়াছে, এবং উহা ঐ সংস্কৃত শ্লোকার্ধে বর্ণিত হইয়াছে : পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।

ভগবদ্গীতা জন্ম ও অবস্থা(বর্ণাশ্রম)-গত কর্তব্যের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্ ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা ঐ ব্যক্তির বর্ণ আশ্রম ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই অনেকটা নিরূপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহন করিয়াছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে এমন কাজ করা, যাহা দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও কার্যপ্রণালী প্রচলিত

নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ। একজন মার্কিন ভাবেন, তাহাঁর দেশের রীতিনীতি অনুসারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভালো এবং যে-কেহ ঐ রীতি অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। একজন হিন্দু(ভারতবাসী) ভাবে, তাহার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ট ও সত্য, সুতরাং যে-কেহ উহা অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। আমরা সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্রমে পড়িয়া থাকি। ইহা বড়ই অনিষ্টকর; সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখা যায়, তাহার অর্ধেক এই ভ্রম হইতেই উৎপন্ন।

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন চিকাগো মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, পিছন হইতে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরিযা এক টান মারিল। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, তাঁহাকে বেশ ভদ্রলোকের মতো দেখিতে। আমি তাহার সহিত দুএকটি কথা বলিলাম; আমি ইংরেজী জানি বুঝিবা মাত্র লোকটি খুব লজ্জিত হইল। আর একবার ঐ মেলাতেই আর একজন লোক আমাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দেয়। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সেও লজ্জিত হইল, শেষে আমতা আমতা করিতে করিতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করিয়া বলিল, ‘আপনি এরূপ পোশাক পরিয়াছেন কেন?’ এই-সকল ব্যক্তির সহানুভূতি তাঁহাদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ-দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে-সকল অত্যাচার করে, সেগুলির অধিকাংশেরই

কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্জাত। ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ্য নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-আমি তাঁহার মতো পোশাক পরি না কেন, এবং আমার বেশের জন্য আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে চাহিলেন, তিনি হয়তো খুব ভালো লোক; হয়তো তিনি সন্তানবৎসল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি; কিন্তু যখনই তিনি ভিন্নবেশপরিহিত কাহাকেও দেখিলেন, তখনই তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা লুপ্ত হইয়া গেল। সকল দেশেই আগন্তুক বিদেশীদের শোষণ করা হয়, কারণ তাহারা যে জানে না, নতূন অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, এইজন্য তাহারাও ঐ দেশের

লোকেদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা লইয়া যায়। নাবিক, সৈন্য ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবহার করিয়া থাকে, নিজেদের দেশে ঐরূপ করিবার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনারা ইওরোপীয় ও মার্কিনগণকে 'বিদেশী শয়তান' বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল দিকগুলি দেখিলে তাহারা এরূপ বলিতে পারিত না।

সুতরাং একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি, যেন অপর জাতির আচার-ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমার ভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবর্তিত হয়; কোন বিশেষ সময়ে যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা করাই এ জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রথমেই যেন আমরা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত কর্তব্য অনুসারে কাজ করি; তারপর সমাজে ও জীবনে আমাদের পদমর্যাদা অনুসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। মনুষ্য-স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে, মানুষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা করে না। সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। যদি বা সে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। তবেই তাহার উপর উচ্চতর কর্তব্যের ভার অর্পিত হইবে। এ সংসারে যখন আমরা আগ্রহ সহকারে কাজ করিতে আরম্ভ করি, তখন প্রকৃতিই আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীঘ্রই আমরা আমাদের যথার্থ মর্যাদা খুঁজিয়া পাই, বুঝিতে পারি-কোথায় কাহার স্থান। যে যে-কার্যের উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সন্তোষজনকভাবে সেই পদে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি যেরূপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাজ করিতেছে বলিয়াই যে একজন নিম্নস্তরের মানুষ, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও বিচার করা উচিত নয়; যে যেভাবে সেই কর্তব্য নিষ্পন্ন করে, তাহা দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হইবে।

পরে আমরা দেখিব, কর্তব্যের এই ধারণাও পরিবর্তিত হয়; আরও দেখিব-যখন কর্মের পশ্চাতে স্বার্থপ্রেরণা থাকে না, তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম করিতে পারে।

তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মই আমাদিগকে কর্তব্যজ্ঞানের অতীত কর্মে লইয়া যায়; তখন কর্ম উপাসনায় পরিণত হয়, শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহা লাভ করিবার উপায় এই 'কর্তব্য'। আমরা দেখিব, কর্তব্যের তত্ত্ব-নীতি বা প্রেম-যে-কোন রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, ইহা অন্যান্য যোগের মতোই; ইহার উদ্দেশ্য-'কাঁচা আমি'কে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করা, যাহাতে 'পাকা আমি' নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারেন; ইহার উদ্দেশ্য-নিম্নস্তরের শক্তিক্ষয় নিবারণ করা, যাহাতে আত্মা উচ্চতর ভূমিতে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। নীচ বাসনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ বা অস্বীকার করিলেই আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বাসনা কমাইতে কমাইতে আমরা মানুষের প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দিই। ভিতরের দিক হইতে দেখিলে কর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা হইতে পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব, আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মসংযম হইতে ধর্মের বিকাশ।

কর্তব্য বিশেষ রুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য-চক্রকে স্নেহসিক্ত করিলে তবেই উহা বেশ সহজভাবে চলিতে থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ! অন্যথা কিভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালন করিতে পারে? আমরা কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সন্মুখীন হইতেছি না? প্রেমমিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাতেই দীপ্তি পায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষার দাস আরও যে শত শত ছোট ছোট ঘটনা জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই, সেইগুলির দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা? আমরা জীবনে যে সব ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সন্মুখীন হই, ঐগুলি সহ্য করাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি।

নারীগণ নিজেদের ঈর্ষাপূর্ণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়া স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং মনে করে, তাহারা যেন নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করিতেছে। তাহারা জানে না যে, এইরূপে তাহারা নিজেদের দাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। যে-সকল স্বামী সর্বদাই স্ত্রীর দোষ দেখে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম; এমন মানুষ নাই বলিলেই হয়-তা সে যতদূর বিপথগামীই হউক না কেন-যাহাকে নম্রা প্রেমিকা সতী স্ত্রী সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে না পারেন। জগৎ এখনও এতটা মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমরা নৃশংস পতি এবং পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, নৃশংস ও অপবিত্র নারীর সংখ্যা যত, ঐরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা যেরূপ সগর্বে বলেন-এবং তাহা শুনিয়া লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে-যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি

আছে, যাহা পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না? যে কল্যাণী সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতন দেখেন, এবং তাহাদের প্রতি জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা-শক্তিতে অতিশয় উন্নত হন; এমন পশুপ্রকৃতি মানুষ একটিও নাই, যে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া অনুভব না করিবে। প্রত্যেক পুরুষও সেইরূপ নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে-ব্যক্তি আবার ধর্মাচার্য হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিবেন, এবং সর্বদা সেরূপ ব্যবহার করিবেন।

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চতর, আর সব ভালবাসা নিম্নতর। মাতার কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয় চিন্তা করা, তারপর নিজের বিষয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন-তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখি

এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মতো। পাখির ছানাদের ডানা উঠিলে তাহারা আর বাপ-মাকে চিনিতে পারে না। সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি নারীকে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূর্তিরূপে দেখিতে সমর্থ। সেই নারীও ধন্য, যাঁহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক। সেই সন্তানেরাও ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের সত্তারূপে দেখিতে সমর্থ।

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায় : আমাদের হাতে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, যে পর্যন্ত না আমরা সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, সেই বড়-অবশ্য তাহার নিজ ব্যবসায় ও কার্যের দৃষ্টিতে।

এক যুবক সন্ন্যাসী বনে গিয়া বহুকাল ধ্যান-ভজন ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। উপরের দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, একটি কাক ও একটি বক গাছের উপর লড়াই করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, 'কি! তোরা আমার মাথায় শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিস?' এই কথা বলিয়া ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া পক্ষীগুলিকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বারা তাঁহার এমনই শক্তি হইয়াছিল! তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল, নিজের এইরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, 'একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক-বক ভস্ম করিতে পারি!'

কিছু পরে ভিক্ষা করিতে তাহাকে শহর যাইতে হইল । একটি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, 'মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।' ভিতর হইতে উত্তর আসিল-'বৎস একটু অপেক্ষা কর।' যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হতভাগিনি, তোর এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস্? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস্ না।' তিনি

মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন; আবার সেই কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, 'বৎস! এত অহংকার করিও না, এখানে কাক বা বক নাই।' তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে সেই নারী বাহিরে আসিলেন, যোগী তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, 'মা, আপনি কিরূপে উহা জানিলেন?' তিনি বলিলেন, 'বাবা, আমি তোমার যোগ-তপস্যা কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্য নারী। তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। সারা জীবন আমি কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে মাতাপিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য পালন করিয়াছি। এখন বিবাহিতা হইয়া স্বামীর প্রতি আমার কর্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য করিয়াই আমর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে চাও তো অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহা শিক্ষা করিলে তোমার পরম আনন্দ হইবে।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'ঐ নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাইব?'

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নগরের নিকটে আসিয়া বাজার দেখিতে পাইলেন। সেখানে দূর হইতে দেখিলেন, এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া বড় ছুরি লইয়া মাংস কাটিতেছে, নানা লোকের সহিত কথা বলিতেছে ও কেনাবেচা করিতেছে। যুবক ভাবিলেন, 'হায় ভগবান্, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে! এ তো দেখিতেছি একটা পিশাচের অবতার!' ইতোমধ্যে ঐ লোকটি চোখ তুলিয়া বলিল, 'স্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন? আমার বেচা-কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া একটু বসুন।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'এখানে আমার কি হইবে?' যাহা হউক, তিনি উপবেশন করিলেন। ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ হইলে পর সে টাকাকড়ি সব লইয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, 'আসুন, মহাশয়, আমার বাটীতে আসুন।' গৃহে উপনীত হইলে ব্যাধ তাঁহাকে একটি আসন দিয়া বলিল, 'একটু অপেক্ষা করুন।' তারপর বাটীর ভিতরে গিয়া তাহার পিতামাতার হাত-পা ধোয়াইয়া দিল, তাঁহাদিগকে

খাওয়াইল, সর্বপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিল। তারপর সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া একটি আসনে উপবেশন করিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, বলুন- আমি আপনার কি করিতে পারি?'

তখন সন্ন্যাসী তাহাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, মহাভারত-গ্রন্থের অংশরূপে তাহা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত-দর্শনের চরম সীমা। তোমরা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, 'আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিৎ কর্ম করিতেছেন কেন?' তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 'বৎস, কোন কর্মই অসৎ নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কার্য আমার জন্মগত, ইহা আমার প্রারব্ধ-লব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। অনাসক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্টা করি; আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী করিবার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্ন্যাসীও হই নাই। আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই নাই। তথাপি সমাজে আমার অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অনাসক্তভাবে করিয়াই আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে।'

ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী।১ আমি জীবনে যে-সব অতি বিস্ময়কর মানুষ দেখিয়াছি, ইনি তাঁহাদের একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি; কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন না; কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত-কখনও উহা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থাপন করিবেন এবং ঐ তত্ত্ব-সন্মন্ধে অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবেন। তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের রহস্য সম্বন্ধে বলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'২-

যখন তুমি কোন কার্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না; পূজারূপে-সর্ব্বোচ্চ পূজারূপে উহার অনুষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ কর।

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও সর্বান্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম করিতেন, ফলে তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস-যে-কোন আশ্রমের কর্তব্যই হউক না কেন, যথার্থ অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমরা আত্মজ্ঞান-বিষয়ক চরম অনুভূতি লাভ করিব।

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্মীই-তাহার অদৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং ঐগুলিই অমোঘ অস্ত্র হইয়া তাহার স্বার্থপরতা এ ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমরা যে কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ-আমরা সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা নিম্ন-অবস্থানির্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিও ঠিক ঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে-সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম চিন্তা উঠিত-কখন ভাবিতাম, আমি একটা মস্তবড় সম্রাট; কখন বা নিজেকে অন্য কোনরূপ একটা বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও বাল্যকালে এরূপ চিন্তা করিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র; প্রকৃতিই সর্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধান করিয়া থাকে-তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে-যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে-তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়া থাকি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছিতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে

সর্বাপেক্ষা সন্মানজনক কর্তব্য পালন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, এবং তাহার জীবনটা বিফলতায় পর্যবসিত হইবে। এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে-কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি- সর্বদাই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে পাইব।

৫. পরোপকারে নিজেরই উপকার

কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়তা হয়, সে-বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে 'কর্ম' বলিতে ভারতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি করিয়া ভাগ আছে, যথা-দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ঐ দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র; উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ঐ দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ঐ দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ-যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্থূলতর রূপ। এই অনুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক ধর্মেই ইহা প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই-যতদিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে, ততদিন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহারা সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়-সূক্ষ্ম ভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধারণা করিবার প্রণালী আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

স্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে আমরা প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি না; শব্দসমূহ তো চিন্তারই প্রতীক। অন্য হিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই প্রতীকরূপে দেখা যাইতে পারে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার পশ্চাতে মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞান পুরাপুরিভাবে মানব-সৃষ্ট নয়। কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বসিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি প্রতীকের সৃষ্টি করিলেন-এরূপ নয়। প্রতীকগুলি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই

কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। তোমাদের অনেকের ধারণা-খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শেই ক্রুশ-চিহ্ন প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্মের বহু পূর্ব হইতে, মুশা জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব হইতে-এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল। আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির মধ্যেও যে ক্রুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব, সকল জাতিই এই ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহার করিত।

আবার ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার-ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ একটি মানুষের প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক 'স্বস্তিক'() রহিয়াছে। এক সময়ে লোক ভাবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহা ছড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাবিলন ও মিশরে ইহা দেখা যাইত। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে?-এই প্রতীকগুলি শুধু রীতিগত বা কল্পনাপ্রসূত নয়। নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মনুষ্য-মনের সহিত উহাদের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একটা কৃত্রিম বস্তু নয়। কয়েকজন লোক একত্র হইয়া কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবে-এইরূপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে-ইহা সত্য নয়। কোন ভাবই তাহার অনুরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অথবা কোন শব্দই তাহার অনুরূপ ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেদ্য। ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ বা বর্ণপ্রতীক- উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। বধির ও মূক ব্যক্তিদিগকে শব্দপ্রতীক ছাড়া অন্য প্রতিকের সাহায্যে চিন্তা করিতে হয়। মনের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিপূরক হিসাবে একটি করিয়া রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদিগকে 'নাম-রূপ' বলা হয়। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব, সেরূপ কৃতজরিম উপায়ে প্রতীক সৃষ্টি করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকগুলির মধ্যে মানবজাতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্যান্য বাহ্য আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন

নাই- এ-কথা বলা খুব সহজ। আজকাল ছোট শিশুও এ-কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও অতি সহজেই দেখা যায়-যাহারা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না, তাহাদের চেয়ে যাহারা মন্দিরে উপাসনা করে, তাহারা অনেক বিষয়ে অন্যরূপ। এই কারণে কোন কোন ধর্মের সহিত যে-সব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থূল ক্রিয়াকলাপ ছড়িত আছে, তাহা সেই সেই ধর্মাবলম্বীর মনে-ঐ স্থূল বস্তুগুলি যেসব ভাবে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। আর অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবারে উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। এই সকল বিষয়ের চর্চা ও অভ্যাস স্বভাবতই কর্মযোগের একটি অংশ।

এই কর্ম-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি এই-'ভাব' ও 'শব্দ'-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে এবং শব্দশক্তিদ্বারা কি সাধিত হইতে পারে, তাহা জানা। সকল ধর্মে শব্দশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি কোন কোন ধর্মে সকগ্র সৃষ্টিই 'শব্দ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহ্যভার 'শব্দ'; আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সঙ্কল্প ও ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু 'শব্দ' হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। এই জড়বাদী ইহসর্বস্ব জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নায়ুগুলি অচেতন ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যতই আমরা বৃদ্ধ হই, যতই আমরা এই জগতে ঘা খাইতে থাকি, ততই আমরা অনুভুতিহীন হইয়া পড়ি; আর যে- সকল

ঘটনা বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলিকেও আমরা অবহেলা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজস্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমরা এই-সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়া বিস্মিত হই ও সেগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর এইরূপ বিস্ময়ই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির প্রথম সোপান। শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় করিয়া থাকে। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি , আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। আমার কথা দ্বারা বায়ুর যে কম্পন হইতেছে, তাহা তোমার কর্ণে গিয়া

তোমার স্নায়ুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পার না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে 'মূর্খ' বলিল-অমনি সে উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তাহার নাকে ঘুষি মারিল। দেখ- শব্দের কি শক্তি! ঐ এক নারী দুঃখে-কষ্টে কাঁদিতেছে; আর এক নারী আসিয়া তাহাকে দুই-চারিটি মিষ্টিকথা শুনাইলেন। অমনি সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইল, তাহার শোক-দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি! উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচন্ড শক্তি। এ-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধান না করিয়াও আমরা দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি। এই শক্তির প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং যথাযথভাবে উহার ব্যবহার করা কর্মযোগের অঙ্গবিশেষ।

অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ-অপরকে সাহায্য করা, জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেদেরই সাহায্য করিতেছি। আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ-প্রেরণা হয়; কিন্তু যদি আমরা বিশেষ বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিব, আমাদের নিকট হইতে এই জগতের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নাই। তুমি আমি আসিয়া উপকার করিব বলিয়া এই জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। আমি একবার এক(খ্রীষ্টীয়) ধর্মোপদেশে পড়িয়াছিলাম, 'এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ এখানে আমরা অপরকে সাহায্য করিবার সময় ও সুবিধা পাই।' বাহ্যতঃ ইহা অতি সুন্দর ভাব বটে, কিন্তু জগতে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন-এইরূপ বলা কি ঈশ্বরনিন্দা নয়? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যত কাজ করি, তাহার মধ্যে অপরকে সাহায্য করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখিব-পরকে সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা। বাল্যকালে আমার কতকগুলি সাদা ইঁদুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে, তাহাতে ছোট ছোট চাকা ছিল। ইঁদুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিত, অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইঁদুরগুলি আর অগ্রসর

হইতে পারিত না। এই জগৎ এবং উহাকে সাহায্য করাও সেইরূপ। তবে এইটুকু উপকার হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি জগৎ-সম্বন্ধে ভাবিতে আবম্ভ করে, তবে তাহার কাছে জগৎ -হয় নরম বা শক্ত, ঠান্ডা বা গরমরূপে প্রতিভাত হইবে। আমরা একরাশ সুখ বা দুঃখের সমষ্টিমাত্র। আমরা জীবনে শত শত বার ইহা অনুভব করিয়াছি। যুবকেরা সাধারণতঃ সুখবাদী(optimist), এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী (pessimist) হইয়া থাকে। যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে; বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে-তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে, শত শত বাসনা তাহাদের হূদয় আলোড়িত করিতেছে, কিন্তু এখন সেগুলি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্খ। আমরা যেরূপ মন লইয়া জীবনকে দেখি, উহা সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নতুবা স্বরূপতঃ এই জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়। স্বরুপতঃ অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন উহা আমাদিগকে সুখতপ্ত রাখে, তখন আমরা বলি-অগ্নি কি সুন্দর! আবার যখন উহা আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, তখন আমরা অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি। অগ্নি কিন্তু স্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয়। আমরা উহার যেমন ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব জ্রাগত করে; জগৎ-সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ; এ-কথার অর্থ-জগৎ নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলিয়া যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না।

তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে; ইহাই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্তু আমাদের সর্বদাই জানা উচিত যে, পরোপকার করা এক পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া গরীবকে বলিও না, ‘এই নে বেচারা’, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও-ঐ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও। সব ভাল কাজই

আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। আমরা খুব বেশী কি করিতে পারি?- একটা হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতব্য আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি! গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তো আমরা বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার মধ্যে দশ লক্ষ টাকায় একটা হাসপতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাকা নাচ-তামাশা-মদে খরচ করিতে পারি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরীবদের কাছে পৌঁছিল। কিন্তু তাহাতেই বা হইল কি? এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে। তবে করিব কি?

এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ি সব উড়িয়া যাইতে পারে। অতএব এস, জগতের উপকার করিব-এই অজ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, সর্বদাই লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের পক্ষে এক আশীর্বাদস্বরূপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। আমরা যে-সব ভিখারীকে সাহায্য করি, তাহারা কেহই আমাদের এক পয়সা ধারে না; আমরাই তাহাদের নিকট ঋণী, কারণ সে তাহার উপর আমাদের দয়াবৃত্তি অনুশীলন করিতে অনুমতি দিয়াছে। আমরা জগতের কিছু উপকার করিয়াছি বা করিতে পারি, অথবা অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি-এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা মূর্খের চিন্তা, আর ঐরূপ চিন্তা দুঃখজনক। আমরা মনে করি, আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি; এবং আশা করি, সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে; আর সে ধন্যবাদ না দিলে আমরা মনে কষ্ট পাই। আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশা করিব? যাহাকে সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। মানুষকে সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়? যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম, তবে এই বৃথা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাম এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল করিতে পারিতাম। আসক্তিশূন্য হইয়া কাজ করিলে অশান্তি বা দুঃখ কখনই আসিবে না। এই জগৎ সুখ-দুঃখ লইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে এবং আমরা উহাকে সাহায্য করিবার

জন্য কিছু করি বা না করি, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি :

একজন গরীব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াছিল যে, কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়া সে অর্থ বা যাহা কিছু চায় সবই পাইতে পারে। অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাকে ভূত দিতে পারে এমন একটি লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে মহা-যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন এক সাধুর সহিত তাহার দেখা হইল। সে ঐ সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিল। সাধু বলিলেন, 'ভূত লইয়া তুমি কি করিবে?' সে বলিল, 'আমার একটি ভূত চাই। সে আমার হইয়া কাজকর্ম করিবে। কিরূপে একটি ভূত পাইব তাহার উপায় শিখাইয়া দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়োজন।' সাধু বলিলেন, 'অত বিক্ষুব্ধ হইও না, বাড়ি যাও।' পরদিন সে পুনরায় সাধুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে একটি ভূত দিন। কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাই-ই-চাই।'

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই যাদুমন্ত্র লও; ইহা জপ করিলে একটি ভূত আসিবে-তাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে তাহাই করিবে। কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রাণী-তাহাকে অবিরত কাজে ব্যস্ত রাখিতে হয়; তাহাকে কাজ দিতে না পারিলে সে তোমার প্রাণ লইবে!'

লোকটি বলিল, 'ইহা তো অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাহাকে তাহার জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পারি।' এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনিক দিন ধরিয়া ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার সম্মুখে এক বিরাট ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'আমি ভূত-আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াছি; কিন্তু আমাকে সর্বদা কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। যে মুহূর্তে কাজ দিতে না পারিবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব।' লোকটি বলিল, 'আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দাও।' ভূত বলিল, 'হাঁ, প্রসাদ নির্মিত হইয়াছে।' লোকটি বলিল, 'টাকা আনো।' ভূত বলিল, 'এই লও টাকা।' লোকটি বলিল, 'এই বন কাটিয়া এখানে একটি শহর তৈরি কর।' ভূত বলিল, 'তাহাও হইয়াছে।

আর কিছু করিতে হইবে?' তখন লোকটির ভয় হইল; সে ভাবিতে লাগিল,-'ইহাকে তো আর কোন কাজ দিবার নাই, এ তো দেখিতেছি এক মুহূর্তে সব সম্পন্ন করে!' ভূত বলিল, 'আমাকে কিছু কাজ দাও, নাইলে তোমায় খাইয়া ফেলিব।' ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভবিয়া না পাইয়া বেচারা অতিশয় ভয় পাইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাধুর নিকট পৌঁছিয়া বলিল, 'প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।' সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' লোকটি বলিল, 'ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি যা বলি তাই সে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে; আর যদি তাহাকে কাজ না দিই তাহা হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।' ঠিক তখনই 'তোমাকে খাইয়া ফেলিব' বলিতে বলিতে ভূত আসিয়া হাজির হইল। খায় আর কি! লোকটি ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার জীবন-রক্ষার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাধু বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি; ঐ কুকুরটির দিকে চাহিয়া দেখ-উহার বাঁকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া উহার লেজটি কাটো, তারপর ভূতটিকে উহা সোজা করিতে দাও।' লোকটি কুকুরের লেজ কটিয়া ভূতকে দিয়া বলিল, 'ইহা সোজা করিয়া দাও।' ভূত উহা লইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সোজা করিল, কিন্তু যেমনি ছাড়িয়া দিল, অমনি উহা গুটাইয়া গেল। আবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া লেজটি সোজা করিল-ছাড়িয়া দিতেই উহা গুটাইয়া গেল। আবার সে ধৈর্য সহকারে লেজটি সোজা করিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিবামাত্র উহা বাঁকিয়া গেল। এইরূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'জীবনে কখনও এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই। আমি পুরাতন পাকা ভূত, কিন্তু জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই।' অবশেষে লোকটিকে বলিল, 'এস তোমার সঙ্গে আপস করি। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমিও তোমাকে যাহা যাহা দিয়াছি সবই রাখিতে দিব, এবং প্রতিজ্ঞা করিব-কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না।' লোকটি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত এই চুক্তি স্বীকার করিল।

এই জগৎটা কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মতো; মানুষ শত শত বৎসর যাবৎ ইহা সোজা করিবার চেষ্টা করিতেছে,

কিন্তু যখনই একটু ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহা আবার গুটাইয়া যায়। অন্যথা আর কিরূপ হইবে? প্রথমেই জানা উচিত, আসক্তিশূন্য হইয়া কিভাবে কাজ করিতে হয়; তাহা হইলেই আর গোঁড়ামি আসিবে না। যখন আমরা জানিতে পারি, এই জগৎ কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মতো, এবং উহা কখনও সোজা হইবে না, তখনই আমরা আর গোঁড়া হইব না।

অনেক প্রকার গোঁড়া আছে-মদ্যপান-নিবাবক, চুরুট-নিবারক ইত্যাদি। এক সময়ে এই ক্লাসে একজন যুবতী মহিলা আসিতেন। তিনি এবং আর কয়েকজন মহিলা মিলিয়া চিকাগোয় একটি হল-বাড়ি করিয়াছেন; সেখানে শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। একদিন তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এই-সকল দোষের প্রতিকারের উপায় তিনি জানেন। আমি সে উপায়টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি কি হল-বাড়িটির কথা জানেন না?' তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার মতে মানবজাতির যাহা কিছু অশুভ, ঐ 'হল-বাড়ি'টি তাহার অব্যর্থ মহৌষধ। ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাঁহারা মনে করেন, মেয়েদের যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। এই সবই গোঁড়ামি; আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও গোঁড়া হইতে পারেন না।

গোঁড়ারা ঠিক ঠিক কাজ করিতে পারে না। জগতে যদি গোঁড়ামি না থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিত। গোঁড়ামি দ্বারা মানবজাতির উন্নতি হয়-এরূপ চিন্তা করা ভুল। পক্ষান্তরে বরং উহাতে উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া যায়। আমরা যাহা করি বা আমাদের যাহা আছে, মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা আমাদের নাই, তাহার কোন মূল্য নাই।

অতএব যখনই গোঁড়ামির ভাব আসিবে, তখন সর্বদাই সেই কুকুরের লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোমার উদ্বিগ্ন অথবা বিনিদ্র হইবার প্রয়োজন নাই; তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে। যখন তোমার এই গোঁড়ামি থাকিবে না, কেবল তখনই

তুমি ভালভাবে কাজ করিতে পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠান্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা উত্তমরূপে বিচার করিয়া কাজ করে, যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাজ করে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গোঁড়ারা নির্বোধ-সহানুভূতিহীন; তাহারা জগৎকে তো সোজা করিতে পারেই না, নিজেরাও পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তোমাদের নিজেদের ইতিহাসে 'মেফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত ব্যক্তিদের কথা কি স্মরণ নাই? যখন তাঁহারা প্রথমে এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা 'পিউরিটান' ছিলেন, নিজেদের খুব পবিত্র ও সাধু প্রকৃতি মনে করিতেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহারা অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়।

যাহারা নিজেরা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসে, তাহারাই আবার সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আমি দুইটি অদ্ভুত জাহাজের কথা শুনিয়াছি- প্রথম 'নোয়ার আর্ক' ও দ্বিতীয় 'মে-ফ্লাওয়ার'। য়াহাদীরা বলেন, সমুদয় সৃষ্টি 'নোয়ার আর্ক' হইতে আসিয়াছে; আর মার্কিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আসিয়াছে। এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আসেন নাই। এ আর এক রকমের গোঁড়ামি। গোঁড়াদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ নব্বইজনের যকৃত দূষিত, অথবা তাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অথবা তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেরাও বুঝিবেন যে, গোঁড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ-আমি ইহা যথেষ্ট দেখিয়াছি। প্রভু আমাকে গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করুন।

এই গোঁড়ামি-সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছি যে, আমাদের কোনপ্রকার গোঁড়া বা একঘেয়ে সংস্কার কার্যের সহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা কি বলিতে চাও যে, মদ্যপান-নিবারক গোঁড়ারা মাতাল-বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে? গোঁড়াদের গোঁড়ামির কারণ এই যে, তাহারা

এই গোঁড়ামি করিয়া নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ইহারা লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়। এই গোঁড়ার দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই শিখিবে-কিরূপে প্রকৃতভাবে ভালবাসিতে হয় এবং সহানুভূতি করিতে হয়, তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহানুভূতি করা সম্ভব হইবে; তখনই বুঝিবে-সেও তোমার মতো একজন মানুষ; তখনই তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নানা অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার মতো অবস্থায় পড়িতে, হয়তো আত্মহত্যা করিতে। আমার একটি নারীর কথা মনে হইতেছে-তাহার স্বামী ছিল ঘোর মাতাল। স্ত্রীলোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত পানদোষ-সম্বন্ধে অভিযোগ করিত। আমার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা-অধিকাংশ লোক তাহাদের স্ত্রীর দোষে মাতাল হইয়া থাকে। তোষামোদ করা আমার কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে-সকল অবাধ্য মেয়েদের মন হইতে সহ্যগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুঠোর ভিতর রাখিবে, এবং যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলে, তখনই চীৎকার করিতে থাকে-এরূপ মেয়েবা জগতের মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এই নারীগণ অর্ধাশনপীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে; আর তাহারাও বলিতেছে, 'মহিলাগণ, আপনারাই জগতের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব।' তখন আবার ঐ রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে 'ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক' আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে।

এইরূপেই জগৎ চলিতেছে, কিন্তু জীবনটা তো এরূপ একটা তামাশা নয়; জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় অনেক আছে।

এখন তোমাদিগকে আজিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি পুনরালোচনা করিতে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী;

জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন বিশ্ব জগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কাজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য-দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা। এ জগৎ একটি বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশালা-এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে দিন দিন আমরা আরও বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারি। চতুর্থতঃ আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিপরীত। গোঁড়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসে, 'আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে, এমন মানুষ দেখিবার জন্য আমি দূর-দূরান্তরে যাইতেও প্রস্তুত। ঐরূপ বলা খুব সহজ! যদি আমরা উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারি, তবে তো আমরা সিদ্ধ হইয়া যাই! ঐরূপ করা বড় সহজ নয়। অধিকন্তু যতই আমরা ধীরস্থির হইব এবং আমাদের স্নায়ুসমূহও যতই শান্ত হইবে, ততই আমরা অধিকতর প্রেমসম্পন্ন হইব এবং আরও ভালরূপে কর্ম করিতে সমর্থ হইব।

৬. অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কায় মন ও বাক্য দ্বারা কৃত প্রত্যেক কার্যই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের কার্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তোমরা হয়তো সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কেহ যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সে ক্রমশঃ আরও মন্দ হইতে থাকে এবং যখন সৎকার্য করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে-সর্বদাই ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আর এক মনের উপর কার্য করে-এই তত্ত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্তিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, আমি যখন কোন কর্ম করিতেছি, তখন আমার মন কোন নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একসুরে বাঁধা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও সেই সুরে বাজিয়া উঠিবার প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইরূপ যে-সকল মন একসুরে বাঁধা, একরূপ চিন্তা তাহাদের উপর সমভাবে কার্য করিবে। অবশ্য দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হইবে, কিন্তু মনের প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদা থাকিবে। মনে কর, আমি কোন মন্দ কাজ করিতেছি, আমার মন কম্পনের এক বিশেষ সুরে রহিয়াছে, তাহা হইলে জগতের সেইরূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভবনা থাকিবে। এইরূপে যখন আমি কোন ভাল কাজ করি, তখন আমার মন আর এক সুরে বাজিতেছে এবং সেই সুরে বাঁধা সকল মনই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। তানশক্তির তারতম্য অনুসারে মনের উপর মনের এই প্রভাব-বিস্তারের শক্তিও কম-বেশী হয়।

এই উপমাটি লইয়া আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা যাইবে যে, আলোকতরঙ্গগুলি যেমন কোন বস্তুতে প্রতিহত হইবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারে, এই চিন্তাতরঙ্গগুলিও যতদিন না সমভাবে স্পন্দিত হইবার মতো একটি বস্তু লাভ করে, ততদিন হয়তো শত শত বৎসর ঘুরিতে থাকিবে। খুব সম্ভব আমাদের এই বায়ুমন্ডল এইরূপ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত প্রত্যেকটি চিন্তাই যেন এইরূপ স্পন্দিত হইয়া ভ্রমন করিতেছে-যতদিন না উহা একটি উপযুক্ত আধার প্রাপ্ত হয়। যে-কোন চিত্ত এই আবেগসমূহের কিছু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত শীঘ্রই ঐভাবে স্পন্দিত হয়। সুতরাং যখন কেহ কোন অসৎ কর্ম করে, তখন তাহার মন এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়; আর সেই সুরের যে-সকল তরঙ্গ পূর্ব হইতেই বায়ুমন্ডলে রহিয়াছে, সেগুলি তাহার

মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই যে অসৎ কাজ করে, সে সাধারণতঃ দিন দিন আরও বেশী অসৎ কাজই করিতে থাকে। তাহার কর্ম ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। যে ভাল কাজ করে, তাহার পক্ষেও এইরূপ। তাহার বায়ুমন্ডলে শুভতরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভবনা; সুতরাং তাহার শুভকর্মগুলি অধিক শক্তিলাভ করিবে। অতএব অসৎ কর্ম করিতে গিয়া দুই প্রকার বিপদে আমরা পড়িতে পারি-প্রথমতঃ আমাদের চারিদেকের অসৎ প্রভাবগুলিতে আমরা যেন গা ঢালিয়া দিই; দ্বিতীয়তঃ আমরা নিজেরা এরূপ সব অশুভ তরঙ্গ সৃষ্টি করি, যেগুলি শত শত বৎসর পরেও অপরকে আক্রমণ করিতে পারে। হইতে পারে আমাদের অশুভ কার্য অপরকে আক্রমণ করিবে। অসৎ কর্ম করিয়া আমরা নিজেদের এবং অন্যেরও অনিষ্ট করি; সৎ কর্ম করিয়া নিজেদের এবং অন্যেরও উপকার করি। অন্যান্য শক্তির ন্যায় মানুষের অভ্যন্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির হইতে বল সঞ্চয় করে।

কর্মযোগের মতে কৃতকার্য ফল প্রসব না করিয়া কখনই নষ্ট হইতে পারে না; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কোন অসৎ কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব; জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা উহাকে রোধ করিতে পারে।

এইরূপে কোন সৎকর্ম করিলেও জগতে কোন শক্তিই শুভ ফল রোধ করিতে পারে না। কারণ থাকিলে কার্য হইবেই; কিছুই উহাকে বাধা দিতে পারে না-রোধ করিতে পারে না। এখন কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতেছে, যথা-আমাদের এই-সকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আমরা একটি সীমারেখা টানিয়া বলিতে পারি না-এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর একটি সম্পূর্ণ মন্দ। এমন কোন কর্ম নাই, যাহা একই কালে শুভ অশুভ দুই প্রকার ফলই প্রসব না করে। একটি নিকটের উদাহরণ লওয়া যাক : আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি; তোমাদের মধ্যে হয়তো কেহ কেহ ভাবিতেছ, আমি ভাল কাজ করিতেছি। কিন্তু ঐ একই সময়ে হয়তো আমি বায়ুমন্ডলস্থ সহস্র সহস্র কীটাণু ধ্বংস করিতেছি। এইরূপে আমি কাহারও অনিষ্ট করিতেছি। যখন আমাদের কাজ নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমরা ঐ কাজকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমরা ভাল বলিতে পারো, কীটাণুগুলি কিন্তু তা বলিবে না। কীটাণুগুলিকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, নিজেদেরই দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর কথা বলার প্রভাব প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগুলির উপর উহার প্রভাব তত প্রত্যক্ষ নয়। এইরূপে যদি আমরা আমাদের অসৎ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব-ঐগুলি দ্বারাও হয়তো কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে। যিনি শুভ কর্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আবার অশুভের মধ্যে কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম-রহস্য বুঝিয়াছেন।১

১ তুলনীয়ঃগীতা, ৪। ১৮

কিন্তু ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ অপবিত্র-এখানে হিংসা বা অহিংসা এই অর্থে 'অপবিত্রতা' অথবা 'পবিত্রতা' গ্রহণ করিতে হইবে। অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমরা শ্বসপ্রশ্বাসত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমরা বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুনই অপর

কতকগুলি প্রাণীর কষ্ট হইতেছে; হইতে পারে তাহারা মানুষ অথবা প্রাণী অথবা কীটাণু, কিন্তু যাহারই হউক না, আমরা কোন-না-কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কুচিত করিতেছি, স্থানসঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। এইরূপই যদি হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্মদ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ করা যায় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার-রূপ গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইবে না; তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারো, কর্মফলে শুভ ও অশুভের অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নাই।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই : কর্মের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময়ে এই জগৎ পূর্ণতা লাভ করিবে; তখন ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ বা দুর্নীতি থাকিবে না। ইহা খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহা খুবই প্রেরণা যোগায়, কিন্তু যদি আমরা এক মুহূর্ত চিন্তা করি, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিব, এরূপ কখনও হইতে পারে না। কিরূপে ইহা হইতে পারে?-ভাল-মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কিরূপে পাওয়া যায়? পূর্ণতার অর্থ কি? 'পরিপূর্ণ জীবন' একটি স্ব-বিরোধী বাক্য। প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তুর সহিত আমাদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমরা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছি, যদি আমরা ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহার ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা-এই তো জীবন! আহার বা বায়ু না পাইলেই আমাদের মৃত্যু। জীবন একটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, উহা রীতিমত একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে যে জটিল সংগ্রাম, তাহাকেই আমরা জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে-এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে।

আদর্শ সুখ বলিতে বুঝায়-এই সংগ্রমের সমাপ্তি। কিন্তু তাহা হইলে জীবনও শেষ হইবে, কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ হইতে পারে যখন জীবনের শেষ। এই অবস্থার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমরা থাকিব

না। অতএব অন্যত্র হয় হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ-এই আদর্শ যুগ-কখনই আসিতে পারে না।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য করি, তাহার মুখ্য ফল-আমাদের চিত্তশুদ্ধি। সর্বদা অপরের কল্যাণচেষ্টা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি।

এই আত্মবিস্মৃতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। মানুষ মূর্খের মতো মনে করে-স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে, এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

পরোপকার-মূলক প্রতিটি কার্য, সহানুভূতিসূচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে আমরা যেটুকু সাহায্য করি-এরূপ প্রত্যেকটি সৎকার্য আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'র গরিমা কমাইতেছে এবং আমাদের ভাবিতে শিখাইতেছে, আমরা অতি সামান্য, সুতরাং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদর্শ-অনন্তকালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ ,যেখানে কোন 'আমি' নাই সব 'তুমি'। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মানুষকে ঐ লক্ষ্যেই লইয়া যায়।

একজন ধর্মপ্রচারক নির্গুণ(ব্যক্তিভাবশূন্য) ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ভয় পাইতে পারেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব-এগুলির তাৎপর্য তিনি যাহাই বুঝুন-অক্ষুন্ন রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে নৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাই সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই ভাবটি মনুষ্যে পশুতে বা দেবতায়-সর্বত্র সমভাবে একমাত্র 'মাপকাঠি'রূপে প্রয়োগ করিতে পারো; এই আত্মত্যাগই সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে অনুস্যূত একমাত্র মূল তত্ত্ব-ইহাই প্রধান ভাব।

এ জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ দেবপ্রকৃতি মানব-ইঁহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করেন। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি কোন দেশে এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিগণ-যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইঁহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক-ইহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু-মহাত্মারা ভালোর জন্যই ভালো করিয়া থাকেন, তেমনি সর্বনিম্ন প্রান্তে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাহাদের স্বভাব।

দুইটি সংস্কৃত শব্দ আছে : একটি-‘প্রবৃত্তি’, সেইদিকে আবর্তিত হওয়া অর্থাৎ যাওয়া; আর একটি-‘নিবৃত্তি’, সেইদিক হইতে নিবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ ফিরিয়া আসা। ‘সেইদিকে বর্তিত হওয়া’কে সংসার বলি। এই ‘আমি আমার’-যাহা কিছু এই ‘আমি’কে টাকা-কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বারা সর্বদাই সমৃদ্ধ করিতেছে-এইগুলি সব প্রবৃত্তির অন্তর্ভূত।

এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি সব কিছু আঁকড়াইয়া ধরা। সর্বদাই সব জিনিস এই ‘আমি’-রূপ কেন্দ্রে জড়ো করা। ইহাই প্রবৃত্তি-ইহাই মনুষ্যমাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, চারিদিক হইতে যাহা কিছু সব গ্রহন করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ো করা। সেই কেন্দ্র তাহার নিজের মধুর ‘আমি’। যখন এই প্রবণতা ভাঙিতে থাকে, যখন নিবৃত্তি বা ‘সেইদিক হইতে চলিয়া যাওয়ার ভাব’ আসে, তখনই নীতি এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। ‘প্রবৃত্তি’ ও ‘নিবৃত্তি’ উভয়ই কর্ম; প্রথমটি অসৎ কর্ম, দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার পূর্ণতাই সম্পূর্ণ ‘আত্মত্যাগ’-পরের জন্য মন, শরীর, এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎ কর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র জীবনে একটি দর্শনশাস্ত্রও

পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনও কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তো সারা জীবনে একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাঁহার জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাসনা দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং দেখি-জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত সকলে একই স্থানে উপনীত হইলেন, মিলিত হইলেন। এই একস্থান-আত্মত্যাগ। মানুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধর্মবিষয়ক পদ্ধতি যতই ভিন্ন হউক না কেন, পরার্থে আত্ম-বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র মানবজাতি সসম্ভ্রমে ও ভক্তিসহকারে দন্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার মতবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না,- এমন কি যাহারা সর্বপ্রকার ধর্মভাবের বিরোধী, তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ন আত্ম-বিসর্জনের কোন কাজ দেখে, তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা করিতেই হইবে। তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া খ্রীষ্টানও যখন এডুইন আর্নল্ডের ‘এশিয়ার আলোক’ (Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন-যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই প্রচার করেন নাই? ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে, তাহার ও যাহাদের সহিত তাহার মতবিরোধ, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। উপাসক ভক্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরের ভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ রক্ষা করিয়া অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন- ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক’। তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। ইহাই আত্মত্যাগ। দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা দেখেন-এই আপাতপ্রতীয়মান ‘আমি’ ভ্রমমাত্র, এবং সহজেই উহা পরিত্যাগ করেন। ইহাও সেই আত্মত্যাগ। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারকগণ যে শিখাইয়াছেন ‘ভগবান্ জগৎ নন’-তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ। জগৎ এক জিনিস, ভগবান্ আর এক জিনিস-এই পার্থক্য অতি সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর। এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন।

তাহা হইলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন। আর একজন হয়তো কুটীরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই; তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচন্ডভাবে সংসারে মগ্ন।

এখন আমাদের মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক। আমরা বলি, ভাল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তার সঙ্গে কিছু ভাল না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা জানিয়া আমরা কর্ম করিব কিরূপে? এই তত্ত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহারা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে,ধীরে ধীরে আত্মহত্যা করাই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়; কারণ জীবনধারণ করিতে গেলেই মানুষকে ছোট ছোট জীবজন্তুর ও বৃক্ষলতার জীবন নষ্ট করিতে হইবে, অথবা কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়-মৃত্যু। এই মতবাদকে জৈনগণ তাঁহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গীতাতেই ইহার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়-ইহাই অনাসক্তির তত্ত্ব, জীবনে কাজ করিয়া কিছুতেই আসক্ত না হওয়া। জানিয়া রাখো- যদিও তুমি জগতে রহিয়াছ, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; যাহাই কর না কেন, তাহা নিজের জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কার্য যদি সৎ হয,তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ করিতে হইবে , অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন কার্যই হউক, তাহা যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যঞ্জক একটি বাক্য পাওয়া যায়ঃ 'যদি কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াও হত্যা করেন না, বা হত হন না।'১ এইজন্যই কর্মযোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়, 'সংসার ত্যাগ করিও না; সংসারে বাস কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা গ্রহন কর; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্য কাজ একেবারেই করিও না।' ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে মারিয়া ফেল, তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া

দেখ, যেমন প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা বলিতেন, ‘পুরাতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।’ ‘পুরাতন মানুষ’ শব্দের অর্থ : জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নির্মিত হইয়াছে-এই স্বার্থপর ভাব। অজ্ঞ পিতামাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শেখান, ‘হে প্রভো, তুমি এই সূর্য চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ।’ প্রভুর যেন এই-সব শিশুর জন্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না! ইহা শুধু আমাদের কামনারূপ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করা।

১ তুলনীরঃ গীতা, ২। ২; কঠ- উপ,১।২।১৮

সন্তানদিগকে এমন বাজে কথা শিখাইও না। তারপর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আবার আর এক ধরনের নির্বোধ। তাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন, আমরা মারিয়া খাইব বলিয়াই এই-সকল জীবজন্তু সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই জগৎ মানুষের ভোগের জন্য। এও প্রচন্ড নির্বুদ্ধিতা। বাঘও বলিতে পারে, ‘মানুষ আমার জন্য সৃষ্ট’ এবং ভগবানকে বলিতে পারে, ‘প্রভো, মানুষগুলি কি দুষ্ট! তাহারা স্বেচ্ছায় আমাদের সম্মুখে আহাররূপে আসিয়া হাজির হয় না, তাহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে।’ যদি জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরাও জগতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে-এই অতি দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবৎসর ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে, জগতের সেদিকে খেয়ালই নাই। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। জগৎ যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখানি জগতের জন্য।

অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হইলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হৈচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও না; নিজে সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও। আমার গুরুদেব বলিতেন, ‘নিজ সন্তানদের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর।’ দাসী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে, অতি যত্নের সহিত লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান; কিন্তু দাসীকে বিদায় দিবামাত্র সে গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা

ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যায়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাব পোষণ কর। তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর, যাহা কিছু তোমার মনে কর, সবই তাঁহার। অত্যধিক দুর্বলতাই অনেক সময় মহত্তম কল্যাণ ও শক্তির ছদ্মবেশে দেখা দেয়। আমার উপর কেহ নির্ভর করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত দুর্বলতা। এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তি জন্মায় এবং এই আসক্তি হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব। আমাদের মনকে জানানো উচিত যে, এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিই সকলকে সাহায্য করিতেছে। আমরা কোটি কোটি মানুষ না থাকিলেও এইরূপ সাহায্য চলিবে। তোমার আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অপরকে সাহায্য করিয়া আমরা নিজেরাই শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাই তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য। সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ শিক্ষাই শিখিতে হইবে। যখন আমরা সম্পর্ণরূপে ইহা শিক্ষা করিতে পারিব, তখন আর আমাদের দুঃখ থাকিবে না, তখন আমরা সমাজে যেখানে খুশি সেখানে গিয়া মিশিতে পারিব, কোন ক্ষতি হইবে না।

তোমাদের পতি-পত্নী, দাস-দাসী, রাজ্য-এ-সব থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্ত্বটি হৃদয়ে রাখিয়া কাজ কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্য নয়, আর তুমি সাহায্য না করিলে চলিবে না-এমনও নয়, তবেই ঐসকল বস্তু তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই বৎসরই হয়তো তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগৎ কি স্বীয় গতি রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহার স্রোত কি বন্ধ হইয়া আছে? না ইহা ঠিকই চলিয়া যাইতেছে। অতএব তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়া দাও যে, তোমাকে জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্যই আমার জন্ম-এ-কথা চিন্তা করা

কোন মানুষের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। উহা নিছক অহঙ্কার। উহা স্বার্থপরতা-ধর্মের রূপ ধরিয়া প্রতারণা করিতেছে। তোমার অথবা অন্য কাহারও উপর জগৎ নির্ভর করে না- এই ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য যখন তোমার স্মায়ু ও পেশীগুলিকে গঠিত করিবে, তখন কর্মজনিত কোন প্রতিক্রিয়া তোমাকে পীড়িত করিবে না। যখন তুমি কোন লোককে কিছু দাও এবং পরিবর্তে কিছুই আশা না কর, সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকুক এটুকুও না চাও, তখন তাহার অকৃতজ্ঞতা তোমার উপর কোন প্রতিক্রিয়া করিবে না, কারণ তুমি কিছুই প্রত্যাশা কর নাই, কখনই চিন্তা কর নাই যে, তোমার প্রতিদান পাইবার কোন অধিকার আছে। তাহার যাহা প্রাপ্য ছিল, তুমি তাহাই দিয়াছিলে। তাহার নিজ কর্মের ফলেই সে উহা পাইয়াছে, তোমার কর্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মাত্র। কিছু দান করিয়া তুমি গর্ববোধ করিবে কেন-তুমি তো উহার বাহক মাত্র? জগৎ নিজ কর্মের দ্বারা উহা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিল। ইহাতে তোমার অহঙ্কারের কারণ কি? জগৎ কে তুমি যাহা দিতেছ, তাহা এমন একটা বড় কিছু নয়। অনাসক্তির ভাব লাভ করিলে তোমার পক্ষে আর ভাল বা মন্দ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। স্বার্থই কেবল ভাল-মন্দের প্রভেদ করিয়া থাকে। এইটি বুঝা বড় কঠিন, কিন্তু সময়ে বুঝিবে-যতক্ষন না তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও, ততক্ষণ জগতের কোনকিছুই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যতক্ষণ না আত্মা অজ্ঞের মতো হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা হারায়, ততক্ষণ কোন শক্তিই আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অতএব অনাসক্তির দ্বারা তুমি তোমার উপর কোন কিছুর প্রভাব জয় কর- অস্বীকার কর। কোন জিনিসের তোমার উপর কিছু করিবার অধিকার নাই-এ-কথা বলা খুব সহজ; কিন্তু যিনি বাস্তবিকই কোন শক্তিকে তাঁহার উপর কাজ করিতে দেন না, বহির্জগৎ যাঁহার উপর কাজ করিলে যিনি সুখীও হন না, দুঃখিতও হন না-সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি? লক্ষণ এই যে, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য কিছুই তাঁহার মনে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না; সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে থাকেন।

ভারতে ব্যাস-নামক এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বেদান্ত-সূত্রের লেখকরূপে পরিচিত, তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন।

ইঁহার পিতা সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই; তাঁহার পিতামহও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও পারেন নাই; এইরূপে তাঁহার প্রপিতামহও চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র শুকদেব সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্যাস সেই পুত্রকে জ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। নিজে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া তিনি শুকদেবকে জনক-রাজার সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি একজন বড় রাজা ছিলেন এবং 'বিদেহ জনক' নামে অভিহিত হইতেন; 'বিদেহ' শব্দের অর্থ 'দেহজ্ঞানশূন্য', যদিও তিনি একজন রাজা, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্বদা 'আত্মা' বলিয়াই অনুভব করিতেন।

বালক শুককে শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। রাজা জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তিনি পূর্ব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন এই বালক গিয়া রাজপ্রসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরিগণ তাঁহার কোন খবরই লইল না। তাহারা কেবল তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি আসন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না; তিনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন-কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না! তিনি এত বড় একজন ঋষির পুত্র, তাঁহার পিতা সমগ্র দেশে সম্মানিত, তিনি নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহসা রাজার মন্ত্রিগণ এবং বড় বড় কর্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিতরে এক সুশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন, সুগন্ধি জলে স্নান করাইলেন, খুব ভাল ভাল পোশাক পরিতে দিলেন, আট দিন ধরিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিলাসের ভিতর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু এই ব্যবহারের পরিবর্তনে শুকের শান্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল না। দ্বারে অপেক্ষা করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-সকল বিলাসের মধ্যেও তিনি ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল। রাজা তাঁহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাটি দুধ দিয়া বলিলেন, 'এই দুধের বাটিটি লইয়া সাতবার রাজসভা প্রদক্ষিণ করিয়া

এস; সাধবান, যেন এক ফোঁটা দুধও না পড়ে।’ বালকও সেই বাটিটি লইয়া এইসব গীতবাদ্য ও সুন্দরী রমণীগণের মধ্যে দিয়া সাতবার সভা প্রদক্ষিণ করিলেন, এক ফোঁটা দুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছু দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে না। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়া আসিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, ‘তোমার পিতা তোমাকে যাহা শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলব্ধি করিয়াছ; এখন গৃহে গমন কর।’

অতএব দেখা গেল, যে ব্যক্তি নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, বাহিরের কোন বস্তু তহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবার যোগ্য। আমরা সচরাচর দুই মতের মানুষ দেখিতে পাই। কেহ কেহ দুঃখবাদী-তাঁহারা বলেন, এ পৃথিবী কি ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতগুলি ব্যক্তি সুখবাদী-তাঁহারা বলেন, এই জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব! যাঁহারা নিজেদের মন জয় করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখে পূর্ণ, অথবা সুখদুঃখমিশ্রিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা যখন আমাদের মনকে বশীভূত করিতে পারিব, তখন এই সংসার আবার সুখের বলিয়া মনে হইবে। তখন কোন কিছুই আমাদের মনে ভাল বা মন্দ ভাব উৎপন্ন করিতে পারিবে না। আমরা সবই বেশ যথাস্থানে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিতে পাইব। যাহারা প্রথমে সংসারকে নরককুন্ড বলিয়া মনে করে, তাহারাই আত্মসংযমে সমর্থ হইলে এই জগৎকে স্বর্গ বলিবে। আমরা যদি প্রকৃত কর্মযোগী হই এবং নিজদিগকে এই অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা যেখানেই আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় উপনীত হইবই; যখনই এই কল্পিত ‘অহং’ চলিয়া যায়, তখনই যে-জগৎ প্রথমে অমঙ্গলপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহা পরমানন্দে পূর্ণ এবং স্বর্গ বলিয়া বোধ হইবে। ইহার হাওয়া পর্যন্ত শান্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে, প্রত্যেক মানুষের মুখচ্ছবি ভাল বলিয়া বোধ হইবে। ইহাই কর্মযোগের চরম গতি ও উদ্দেশ্য, এবং ইহাই কর্মজীবনে পূর্ণতা বা সিদ্ধ।

অতএব দেখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগ পরস্পর-বিরোধী নয়। প্রত্যেকটিই আমাদিগকে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটিই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসই সিদ্ধির সমগ্র রহস্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস-প্রত্যেক যোগ সম্বন্ধেই ইহা সত্য। প্রথমে শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে; অনেক বিষয় যাহা একেবারে বুঝিতে পার না, তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ ও মননের ফলে স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সব বিষয় শোনামাত্রই বুঝা বড় কঠিন। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে-বাহিরের আচর্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ-সকল তত্ত্ব অনুভব করিব এবং এই অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতে এমন প্রবল কর্মের শক্তি আসিবে যে, তাহা প্রতি শিরায়, প্রতি স্নায়ুতে, প্রতি পেশীতে ক্রিয়া করিতে থাকিবে-যতক্ষণ না তোমার সমুদয় শরীরটি এই নিষ্কাম কর্মযোগের একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ-পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। ইহা কোন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না।

খ্রীষ্টানই হও, য়াহুদীও হও আর জেন্টাইলই হও, তাহাতে কিছু আসে যায় না; একমাত্র জিজ্ঞাসা-তুমি কি স্বার্থশূন্য? যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি ধর্মপুস্তকও না পড়িয়া এবং কোন গির্জায় বা মন্দিরে না গিয়াও সিদ্ধ হইবে। আমাদের বিভিন্ন যোগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র সহায়তা না লইয়া মানুষকে পূর্ণ করিতে সমর্থ; কারণ প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য একই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ-সকল যোগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ ও অন্যনিরপেক্ষ উপায়। 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ'১-অজ্ঞেরাই কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নয়। জ্ঞানীরা জানেন আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শেষ পর্যন্ত ঐ দুই পথ মানুষকে পূর্ণতারূপ একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

৭. মুক্তি

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'কার্য' এই অর্থ ব্যতীত 'কর্ম'-শব্দদ্বারা মনোবিজ্ঞানে কার্য-কারণ-ভারও বুঝাইয়া থাকে। যে কোন কার্য বা যে কোন চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাকেই 'কর্ম' বলে। সুতরাং 'কর্মবিধান' -এর অর্থ কার্য-কারণের নিয়ম-অর্থাৎ কারণ ও কার্যের অনিবার্য সম্বন্ধ। আমাদের(ভারতীয়) 'দর্শন'-এর মতে এই 'কর্মবিধান' সমগ্র বিশ্বজগতের পক্ষেই সত্য। যাহা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, অথবা যে-কোন কাজ করি-বিশ্বজগতে যাহা কিছু কাজ হইতেছে-সবই একদিকে পূর্বকর্মের ফলমাত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কারণ হইয়া অন্য ফল উৎপাদন করে। এই সঙ্গে বিচার করা আবশ্যক 'বিধি' বা 'নিয়ম' বলিতে কি বুঝায়। ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমরা দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা ঘটিতেছে, কখন বা ঘটনা-দুইটি যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমরা আশা করি, সর্বদাই এরূপ ঘটিবে। আমাদের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'ব্যাপ্তি' বলিতেন। তাঁহাদের মতে নিয়ম-সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারাণার কারণ 'অনুষঙ্গ'। ঘটনাপরম্পরা আমাদের মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত থাকে। সেইজন্য যখনই আমরা কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলির সহিত ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব-অথবা আমাদের মনোবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। মনোবিজ্ঞানে ইহাকেই 'ভারানুষঙ্গ-বিধান' বলে, আর 'কার্যকারণ-সম্বন্ধ' এই ব্যাপক বিধানের একটি দিকমাত্র। ভাবানুষঙ্গের এই ব্যাপকতাকেই সংস্কৃতে 'ব্যাপ্তি' বলে। অন্তর্জগতে যেমন ,বহির্জগতেও তেমনি বিধান বা নিয়মের ধারণা একই প্রকার; একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটিবে-তাহা এবং ঘটনা পরম্পরা বার বার ঘটিতে থাকিবে, আমরা এইরূপই আশা করি। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই। কার্যতঃ ইহা বলা ভুল যে, মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথবা প্রকৃতির কোন স্থলে বস্তুগতভাবে কোন নিয়ম আছে। যে প্রণালীতে আমাদের মন কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা ধারণা করে, সেই প্রণালীই নিয়ম; এই নিয়ম আমাদের মনে

অবস্থিত। কতকগুলি ঘটনা একটির পর আর একটি অথবা একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে পুনঃপুনঃ এইরূপ ঘটিবে; ঘটনাপরম্পরা কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের মন এইভাবেই তাহা ধরিতে পারে। ইহাকে বলা হয়-নিয়ম।

এখন জিজ্ঞাস্য-'নিয়ম সর্বব্যাপক' বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের জগৎ অনন্ত সত্তার সেইটুকু অংশ, যাহাকে আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ 'দেশ-কালনিমিত্ত' বলেন এবং ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাহা স্থান কাল ও কারণ(Space, time,causation) বলিয়া পরিচিত।

এই জগৎ সেই অনন্ত সত্তার এতটুকু অংশমাত্র, একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা, দেশ-কাল-নিমিত্তে গঠিত। ঐরূপে ছাঁচে ঢালা অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। অপরিহার্যভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই কার্য-কারণ-নিয়ন্ত্রিত জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। যখন আমরা এই জগতের কথা বলি, তখন আমরা বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, যে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ আমরা অনুভব করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্তা করি এবং কল্পনা করি, সেইটুকুই কেবল নিয়মাধীন; কিন্তু ইহার বাহিরের সত্তা নিয়মের অধীন নয়, যেহেতু কার্য-কারণ-ভাব আমাদের মনোজগতের বাহিরে আর যাইতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের অতীত কোন বস্তুই এই কার্য-কারন-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়, কারণ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভাবানুষঙ্গ-সম্বন্ধ নাই, এবং ভাব-সম্বন্ধ ব্যাতীত কার্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। নাম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা বা চৈতন্য কার্য-কারণ নিয়ম মানিয়া চলেন এবং তখনই বলা হয় উহা নিয়মের অধীন, যেহেতু কার্য-কারণ-সম্বন্ধই সকল নিয়মের মূল। এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; ঐ শব্দগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কারণ ইচ্ছা জ্ঞানের অন্তর্গত এবং যাহা কিছু আমরা জানি সে-সবই আমাদের জগতের অন্তর্গত। আবার জগতের অন্তর্গত সব-কিছুই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে ঢালা। যাহা কিছু আমরা জানি বা যাহা কিছু জানা আমাদের পক্ষে

সম্ভব, সবই কার্য-কারণের অধীন; এবং যাহা কিছু কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন, তাহা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্যান্য বস্তু ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং ইহাও আবার অপরের কারণ হয়, এইরূপ চলিতেছে। যাহা পূর্বে 'ইচ্ছা' ছিল না, কিন্তু ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে পড়িয়া মানুষের ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মুক্তস্বভাব; আর যখন এই ইচ্ছা কার্য-কারণ-চক্র হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন আবার স্বাধীন বা মুক্ত হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা আসে, এই বন্ধনের ছাঁচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আসে, কোথায় অবস্থান করে এবং কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে-মুক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি, বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যখন আমরা বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হইবে সেই সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মানুষ। এই দেহ ও এই মন-যাহা আমরা দেখিতেছি, এগুলি সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র। সমুদয় ব্রহ্মান্ডই সেই অনন্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমাদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, আনন্দ ও বিষাদ, আমদের সুখ ও আশা-সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। আমাদের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতে সীমাবদ্ধ।

অতএব দেখিতেছ, আমাদের মনের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্র জগৎ চিরকাল থাকিবে-এরূপ আশা করা এবং স্বর্গে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করা কি ছেলেমানুষি! স্বর্গের অর্থ-আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। স্পষ্টই দেখিতেছ, অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা কি ছেলেমানুষি ও অসম্ভব বাসনা! অতএব যখন মানুষ বলে, সে এইভাবেই চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে, তাহা লইয়াই চিরদিন থাকিবে, অথবা আমি যেমন কখন কখন বলি, যখন মানুষ 'আরামের ধর্ম' চায়, তখন তোমরা নিশ্চয় জানিও-তাহার এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নততর কিছুই ধারণা করিতে পারে না; সে নিজের অনন্ত স্বরূপ ভুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিন্তা এই-সব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ এবং সাময়িক ঈর্ষায় আবদ্ধ। এই সান্ত জগৎকেই সে অনন্ত

বলিয়া মনে করে। শুধু তাই নয়, সে এই মূর্খতা কোনমতে ছাড়িবে না। সে প্রাণপণে ‘তৃষ্ণা’কে-জীবন-বাসনাকে আঁকড়াইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা ইহাকে ‘তঞ্হা বা তিস্‌সা’ বলে। আমাদের জ্ঞাত ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে অসংখ্য প্রকার সুখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতি এবং অসংখ্য প্রকার কার্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু এ-সবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশমাত্র।

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পর্ণ সাম্যাবস্থা বা খ্রীষ্টানরা যাহাকে ‘বুদ্ধির অতীত শান্তি’ বলিয়া থাকেন, তাহা এই জগতে পাওয়া যাইতে পারে না-স্বর্গেও নয়, অথবা এমন কোন স্থানেও নয়, যেখানে আমাদের চিন্তাশক্তি ও মন যাইতে পারে, যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করিতে পারে, অথবা কল্পনা-শক্তি যাহা কল্পনা করিতে পারে-এরূপ কোন স্থানেই সেই মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এ-সকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের অন্তর্গত হইবে এবং সেই জগৎ দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্থান থাকিতে পারে যেখানে ভোগ তীব্রতর, কিন্তু সে-সকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, সুতরাং নিয়মের বন্ধনের ভিতর; অতএব আমাদেগকে এ-সকল বাহিরে যাইতে হইবে এবং যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান-সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। যতদিন না আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জন দিতে পারি, যতদিন না এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন জগতের অতীত সেই অনন্ত মুক্তির এতটুকু আভাসও পাইবার আশা আমাদের নাই। অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্য-জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য ‘মুক্তি’ লাভ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, সে উপায়-এই ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র জগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বর্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু সীমাবদ্ধ-সব ত্যাগ করা। যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা এখনই মুক্ত হইব।

বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়-সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্য-কারণ-শৃঙ্খল বর্তমান।

কিন্তু এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকেই এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আসক্তি-ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে বলে নিবৃত্তিমার্গ-উহাতে 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) করিয়া সব ত্যাগ করিতে হয়; আর একটিকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ-উহাতে 'ইতি ইতি' করিয়া সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল উন্নতমনা অসাধারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারা শুধু বলেন, 'না, আমি ইহা চাই না'; শরীর ও মন তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে, এবং তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হন। কিন্তু এরূপ মানুষ অতি বিরল। অধিকাংশ লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ-সংসারেরই পথ বাছিয়া লয়; এবং বন্ধনগুলিকেই ঐ বন্ধন ভাঙিবার উপায়রূপে ব্যবহার করে। ইহাও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে-ক্রমশঃ ত্যাগ করা হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিয়া, এইরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইয়া মন অবশেষে ঐগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্তি-লাভের প্রথমোক্ত মার্গের সাধন-বিচার, আর শেষোক্ত পথের সাধন-কর্ম ও অভিজ্ঞতা। প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকার কর্ম করিতে অস্বীকার করাই এ পথের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি নাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, যাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চান না, যাঁহাদের মন কখনও আত্ম হইতে অন্যত্র গমন করে না, আত্মাই যাঁহাদের সর্বস্ব, শুধু তাঁহারাই কর্ম করিবেন না।১ অবশিষ্ট সকলকে অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে।

একটি জলস্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে নামিতেছে। একটি গর্তের ভিতর পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে পরিণত হইল; সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বাহির হইয়া দুর্বারবেগে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্য-জীবন এই প্রবাহের মতো। উহাও ঘূর্ণির

মধ্যে পড়ে-নাম-রূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ 'আমার পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ' প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করে, অবশেষে বাহির হইয়া নিজের মুক্ত-ভাব ফিরিয়া পায়। সমুদয় জগৎ ইহাই করিতেছে, আমরা জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই জগৎরূপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্য কাজ করিতেছি। সংসারআবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

কর্মযোগ কি?-কর্ম-রহস্য অবগত হওয়াই কর্মযোগ। আমরা দেখিতেছি সমৃদয় জগৎ কর্ম করিতেছে। কিসের জন্য? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভের জন্য।

১ তুলনীয়ঃ গীতা,৩। ১৭

পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রণী পর্যন্ত সকলই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য-মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা। সকল বস্তুই সর্বদা মুক্তিলাভ করিতে এবং বন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ-সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎটাকে এই কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি বলা যাইতে পারে। কর্মযোগ আমাদিগকে কর্মের রহস্য-কর্মের প্রণালী শিখাইয়া দেয়। জগতের চতুর্দিকে ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বিচার-বিবেকের পর শেখার পরিবর্তে আমরা কর্মযোগ হইতে কর্মের রহস্য, কর্মের প্রণালী এবং কর্মের সংগঠনীশক্তি সম্বন্ধে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। ব্যবহার করিতে না জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্মযোগ কাজ করাকে একটি রীতিমত বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে। এই বিদ্যা দ্বারা জানিতে পারিবে, এই জগতের সকল কর্মের সদ্ব্যবহার কিভাবে করিতে হয়। কর্ম করিতেই হইবে, ইহা অপরিহার্য-কিন্তু উচ্চতম উদ্দেশ্যে কর্ম কর। কর্মযোগের সাধনায় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহা মধ্য দিয়াই আমাদের চলিতে হইবে; আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। জগতের বন্ধনের বাহিরে

যাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে নিশ্চিতভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। এমন সব অসাধারণ মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, যাঁহাদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তাঁহারা একেবারে জগতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন- যেমন সর্প উহার ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া থাকে। এই-সব অসাধারণ মানুষ কয়েকজন আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশিষ্ট মানবগণকে ধীরে ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। অল্প শক্তি নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্য ও উপায় দেখাইয়া দেয় কর্মযোগ।

কর্মযোগ কি বলে?-বলে, 'নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ কর।' কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও না। মনকে মুক্ত রাখো। যাহা কিছু দেখিতেছ, দুঃখ-কষ্ট-সবই জগতের অপরিহার্য পরিবেশ মাত্র।; দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহারা মোটেই আমাদের স্বভাবগত নয়। আমাদের স্বরূপ দুঃখ ও সুখের পারে-প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি আমাদিগকে সর্বদাই কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। 'আসক্তি হইতেই দুঃখ আসে, কর্ম হইতে নয়।'

যখনই আমরা কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই আমরা দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মের সহিত ঐরূপ এক না হইয়া গেলে সেই দুঃখ অনুভব করি না। কাহারও একখানি সুন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাহার নিজের ছবিখানি পুড়িয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন?

দুইখানিই সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্র অপেক্ষা অন্যক্ষেত্রে অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ-এককক্ষেত্রে মানুষ ছবির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। এই 'আমি ও আমার' ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই স্বার্থ আসে এবং স্বার্থপরতা হইতেই দুঃখ আরম্ভ। প্রতিটি স্বার্থপর কার্য বা চিন্তা আমাদিগকে কোন-না-কোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর দাস হইয়া যাই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ হইতে 'আমি ও আমার' ভাব উত্থিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাসে

পরিণত করে, যতই আমরা 'আমি ও আমার' বলি, ততই দাসত্ব বাড়িতে থাকে, ততই দুঃখও বাড়িতে থাকে। অতএব কর্মযোগ বলে-জগতে যত ছবি আছে, সবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কিন্তু কোনটির সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিও না; 'আমার' কখনও বলিও না। আমরা যখনই বলি, 'এটি আমার', তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিবে। 'আমার সন্তান'-এ-কথা মনে মনেও বলিও না; ছেলেকে আদর কর, তাহাকে নিজ আয়ত্তে রাখো, কিন্তু 'আমার' বলিও না। 'আমার' বলিলেই দুঃখ আসিবে। 'আমার বাড়ি', 'আমার শরীর' এরূপও বলিও না। এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে, যাইতেছে; কিন্তু আমরা মুক্ত-সাক্ষিস্বরূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, শরীরের তদপেক্ষা বেশী নাই। একটা শরীরের প্রতি আমরা এত আসক্ত হইব কেন? যদি কেহ একখানি ছবি আঁকে, সেটি শেষ করিয়া অন্যটিতে হাত দেয়। 'আমি উহা অধিকার করিব'-বলিয়া স্বার্থজাল বিস্তার করিও না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ।

অতএব কর্মযোগে বলা হয় : প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার করিবার প্রবণতা বিনষ্ট কর, যখন উহা দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, তখন মনকে আর স্বার্থপরতার তরঙ্গে পরিণত হইতে দিও না। তারপর সংসারে গিয়া যত পারো কর্ম কর, সর্বত্র গিয়া মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছা যাও, মন্দের স্পর্শ তোমাকে কখনই দূষিত করিতে পারিবে না। পদ্মপত্র জলে রহিয়াছে, জল যেমন কখনও উহাতে লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে; ইহাই 'বৈরাগ্য' বা অনাসক্তি। মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসক্তি ব্যতীত কোন প্রকার 'যোগ'ই হইতে পারে না। অনাসক্তি সকল যোগেরই ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং সুখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিতে গিয়া থাকে, সে অতিশয় আসক্ত হইতে পারে; তাহার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বস্ব হইতে পারে; ক্রমশঃ তাহাকে তাহার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। অনাসক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়া নয়, অনাসক্তি মনে। 'আমি ও আমার'-এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই রহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের

সহিত এই যোগ না থাকে, তবে আমরা যেখনেই থাকি না কেন, যাহাই হই না কেন, আমরা অনাসক্ত।

একজন-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়তো ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত হইয়াই ভয়ানক আসক্ত। প্রথমে আমাদিগকে এই অনাসক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইবে, তারপর নিরন্তর কার্য করিতে হইবে। যে কর্মপ্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে সাহায্য করে, কর্মযোগ আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা অতি কঠিন।

সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি-যাহারা ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য। তাহারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে হইবে-তাহাদেগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি নিশ্চয় অনাসক্ত হইব'। অন্যটি-যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্মের সমরদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, অনুভব করেন, শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য। আমরা যে-কোন ভাল কাজ করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংসা বা সুবিধা দাবি না করি। উহা প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমরা প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃত্তি প্রতি মুহূর্তে তাঁহা হইতেই আসিতেছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।১

-'যাহা কিছু কাজ কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু পূজা হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর।' আমরা নিজেরা যেন সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও

সব-কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহং'কে আহুতি-দানরূপ মহাযজ্ঞ কর।

'জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনস্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজিতে গিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।' দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে : আমার জন্য কিছুই নয়,কোন বস্তু শুভ ,অশুভ বা নিরপেক্ষ – যাহাই হউক না কেন, আমার পক্ষে সবই সমান; আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না, আমি সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।

দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান 'অহংভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে পর্যন্ত না ঐ

১ গীতা,৯। ২৭

ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পর্যন্ত না উহা শিরায় শিরায়, মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে ঐ আত্মাত্যাগরূপ ভাবের অনুগত হইয়া যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের গর্জন ও কোলাহল-পূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত ও শান্ত।

কর্মযোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়-কর্তব্য সাধারণ ভাব কেবল নিম্নভূমিতেই বর্তমান; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখেতেছি, এই অদ্ভুত কর্তব্যবোধ অনেক সময় আমাদের দুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগ-বিশেষ হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সর্বদা টানিয়া লইয়া যায়। কর্তব্য আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। ইহা মনুষ্য-জীবনের ধ্বংসের কারণ। এই কর্তব্য-এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন-সূর্য; উহা মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য ক্রীতদাসদের দিকে ঐ চাহিয়া দেখ! কর্তব্য-বেচারাদের ভগবানকে ডাকিবার অবকাশটুকুও দেয় না, স্নানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না! কর্তব্য যেন সর্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে।

তাহারা বাড়ির বাহিরে গিয়া কাজ করে, তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহারা বাড়ির বাহিরে গিয়া কাজ করে, তাহাদের মাথার উপর কর্তব্য! তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে; কর্তব্যের হাত হইতে মুক্তি নাই! এ তো ক্রীতদাসের জীবন-অবশেষে ঘোড়ার মতো গাড়িতে জোতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথেই পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ! কর্তব্য বলিতে লোকে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় কর্ম করা এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য। আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের। আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়াছি, সেজন্য আমরা ধন্য। আমরা আমেদের নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যাইতেছি; কে জানে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে কর্ম করিলেও আমরা ফল ভোগ করিব না, মন্দভাবে করিলেও চিন্তান্বিত হইব না। শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা কর, কেন তাহারা উহা করিতেছে, তাহারা বলিবে, 'ইহা আমাদের কর্তব্য।' বাস্তবিক উহা কাঞ্চনের জন্য অস্বভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা কতকগুলি ফুল দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

তবে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহা কেবল দেহ-মনের আবেগ আসক্তির তাড়না। কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা তাহাকে কর্তব্য বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ : যে-সব দেশে বিবাহ নাই, সে-সব দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কর্তব্যও নাই। সমাজে যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিবশতঃ একত্র বাস করে। পুরুষানুক্রমে এরূপ থাকার পর একত্র বাস করা রীতিতে পরিণত হয়, তখন উহা কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার পুরাতন ব্যাধি। রোগ যখন প্রবলাকারে দেখা দেয়, তখন আমরা উহাকে 'ব্যারাম' বলি; যখন উহা স্থায়ী দাঁড়াইয়া যায়, উহাকে আমরা 'ব্যারাম'

বলি , যখন উহা স্থায়ী দাঁড়াইয়া যায় উহাকে আমরা স্বভাব বলিয়া থাকি। যাহাই হউক, উহা রোগমাত্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়া যায়, তখন উহাকে 'কর্তব্য'-রূপ আড়ম্বরপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই, তদুপলক্ষে তুরীভেরীও বাজানো হয়, উহার জন্য শাস্ত্র হইতে মন্ত্র উচ্চারাণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ ঐ কর্তব্যের অনুরোধে সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ-সহকারে অপহরণ করিতে থাকে।

কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভাল যে, উহাতে পশুভাব কিছুটা সংযত হয়। যাহারা অতিশয় নিম্নাধিকারী, যাহারা অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে; কিন্তু যাঁহারা কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই। জগৎকে যাহা দিবার আছে অবশ্যই দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয়। উহার জন্য কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হইয়া কিছু করিও না। বাধ্য হইয়া কেন করিবে? বাধ্য হইয়া যাহা কিছু কর তাহা দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয়। কর্তব্য বলিয়া তোমার কিছু থাকিবে কেন?

'সবই ঈশ্বর সমর্পণ কর।' এই সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহে-যেখানে কর্তব্যরূপ অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই অমৃত পান করিয়া সুখী হও। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতেছি, পুরস্কার বা শাস্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাকে শাস্তিও লইতে হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায়-পুরস্কার ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে একসূত্রে গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন, অপরদিকে মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার উপায়-জীবনের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে দেখা। অতএব 'দুঃখশূন্য সুখ' এবং 'মৃত্যুহীন জীবন' কথাগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, বাক্যগুলি স্ববিরোধী, সুতরাং তিনি দুই-ই পরিত্যাগ করেন। যাহা কিছু কর, তার জন্য কোন প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল

কাজ করি, অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করি। যখনই আমরা কোন চাঁদা দিই, অমনি আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি-কাগজে আমাদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন।

নীরবে তাঁহারা জীবন যাপন করিয়া নীরবে চলিয়া যান; সময়ে তাঁহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতো মহামানবে ব্যক্তভাব ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হন। শ্রষ্ঠ মহাপুরুগণ তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য কোন নাম-যশ আকাঙ্খা করেন নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয়া যান, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্পদায় বা ধর্মমত স্থাপন করিয়া যান না। ঐরূপ করিতে তাঁহাদের সমগ্র প্রকৃতি সঙ্কচিত হয়। তাঁহারা শুদ্ধসাত্ত্বিক; তাঁহারা কখনও কোন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন যোগী১দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত আমিত্বের ভাব এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, তাঁহার মনুষ্যভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তে শুধু ব্যাপক ঈশ্বরীয় ভাব তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাঁহার একহাত দংশন করে, তিনি তাঁহাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত, এবং বলেন-ইহা প্রভূর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাঁহার কাছে আসে, তিনি মনে করেন-সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লোকের সম্মুখে বাহির হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভান্ডার।

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিসম্পন্ন বা সংগ্রমশীল পুরুষগণের স্থান। তাঁহারা সিদ্ধপুরুষগণের ভাবরাশি গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার করেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহান্ ভাবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, এবং বুদ্ধ-খ্রীষ্টগণ সেই সব ভাব স্থানে স্থানে গিয়া প্রচার

করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করেন। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্বে যে চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহারা অপরিচিত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ তাঁহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরই নিজ ধর্মপ্রসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা জানেন-ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদূর। তাঁহারা নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাঁহারা কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি সৎ চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সত্যই সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, যাঁহারা জীবনে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্যে পরিণত করিবেন। পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়া জগতে পরোপকার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি কর্ম করা সম্ভব নয়। কর্মীরা যতই ভাল হউন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়।

১ গাজীপুরের পওহারী বাবা।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবে একটু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কর্ম করিতে পারি-কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা অভিসন্ধি ও আসক্তি দ্বারা চালিত হয়। সদাক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াই-পখিটির পতন পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন; তাঁহার সমক্ষে মানুষ তাহার নিজ কার্যের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির পর্যন্ত খবর রাখিতেছেন, তখন ঐরূপ করা কি একপ্রকার ঈশ্বরনিন্দা নয়? আমাদের শুধু কর্তব্য সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার সমক্ষে দন্ডায়মান হইয়া বলা-'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক'। সর্বশ্রষ্ঠ মহামানবেরা কর্ম করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারদের মনে কোন আসক্তি নাই। 'যিনি আত্মাতেই আনন্দ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কার্য নাই।'১ ইঁহারাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইঁহারা কার্য করিতে পারেন না, তা-ছাড়া প্রত্যেককেই কার্য করিতে হইবে। এইরূপ কার্য করিবার সময় আমাদের

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জগতের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পারি; তাহা আমরা পারি না। এই জগৎরূপ শিক্ষালয়ে পরোপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার করিয়া থাকি। কর্ম করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্তব্য। যদি আমরা এইভাবে কার্য করি, যদি আমরা সর্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম করিতে সুযোগ পাওয়া আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, তবে আমরা কখনও উহাতে আসক্ত হইব না। তোমরা আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করে, এ জগতে আমরা সব মস্ত লোক, কিন্তু আমরা সকলেই মরিয়া যাই, তারপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমদের ভুলিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের জীবন অনন্ত-'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'২ যদি সেই সর্বশক্তিমান্ প্রভু ইচ্ছা না করিতেন, তবে কে এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিত, কে এক মুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত? তিনিই নিয়ত-কর্মশীল বিধাতা। সকল শক্তিই তাঁহার এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।৩

-তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সর্বেসর্বা; তিনিই সব, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমরা কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎকর্মের জন্যই সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। এইরূপে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, এবং আমরা পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযোগের লক্ষ্য।

৮. কর্মযোগের আদর্শ

বেদান্ত-ধর্মের মহান্ ভাব এই যে, আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া থাকিঃ কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবাঁধা নয়, অত্যন্ত পৃথক্ নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায়; তবে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ। এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি ব্যতীত যাহার অন্য কোন শক্তি নাই, যে শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্যে। আমরা দেখিয়াছি, শেষ পর্যন্ত এই চারিটি পথ একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন-প্রণালীই আমাদিগকে সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।

সেই চরম লক্ষ্যটি কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি-ঐ লক্ষ্য মুক্তি। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি, পরমাণু হইতে মনুষ্য, অচেতন প্রাণহীন জড়কণা হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান সর্বোচ্চ সত্তা-মানবাত্মা পর্যন্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎ এই মুক্তির সংগ্রাম বা চেষ্টার ফল। সকল যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুই অন্যান্য পরমাণুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং অপরগুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্যের নিকট হইতে এবং চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক পদার্থই অনন্ত বিস্তারের জন্য উন্মুখ। আমরা জগতে যা-কিছু পদার্থ দেখিতেছি, এই জগতে যত কার্য বা চিন্তা আছে, সব-কিছুর একমাত্র ভিত্তি-এই মুক্তির চেষ্টা। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাসনা করেন এবং চোর চুরি করে। যখন কর্মপ্রণালী যথাযথ হয় না, তখন আমরা তাহাকে মন্দ বলি, এবং যখন কর্মপ্রণালীর প্রকাশ যথাযথ ও উচ্চতর হয়, তখন তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণা উভয়ত্র সমান-সেই মুক্তির চেষ্টা। সাধু নিজের বন্ধনের বিষয় ভাবিয়া কষ্ট পান; তিনি বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে চান, সেজন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন। চোরও এই

ভাবিয়া কষ্ট পায় যে, তাহার কতকগুলি বস্তুর অভাব; সে ঐ অভাব হইতে মুক্ত হইতে চায় এবং সেইজন্য চুরি করে। চেতন, অচেতন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য এই মুক্তি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগৎ ঐ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সাধুর ঈপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পর্ণরূপে পৃথক্। সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়া অনন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে।

প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তির জন্য প্রনপণ চেষ্টার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। ইহা সমুদয় নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তি। নিঃস্বার্থপরতার অর্থঃ 'আমি এই ক্ষুদ্র

শরীর'-এইভাব হইতে মুক্ত হওয়া। যখন আমরা দেখিতে পাই, কোন লোক ভাল কাজ করিতেছে, পরোপকার করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে-সেই ব্যক্তি 'আমি ও আমার' রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। এই স্বার্থপরতার গন্ডির বাহিরে যাওয়ার কোন সীমা নাই। চরম স্বার্থত্যাগ সকল বড় বড় নীতিশাস্ত্রেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচারিত। মনে কর, একজন এই চরম স্বার্থত্যাগের অবস্থা লাভ করিল, তখন তাহার কি হইবে? তখন সে আর ছোটখাট শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক থাকে না; সে তখন অনন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে তাহার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়। সে তখন অনন্ত-স্বরূপ হইয়া যায়। এই অনন্ত বিস্তৃতিই সকল ধর্মের, সকল নীতিশিক্ষার ও দর্শনের লক্ষ্য। ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্ত্বটি দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত দেখেন, তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। নীতি প্রচার করিতে গিয়া তিনি নিজেই আবার সেই একই তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনিও মানুষের নিঃস্বার্থপরতার কোন সীমা নির্দেশ করেন না। মনে কর, এই ব্যক্তিত্ববাদ-মতে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইলেন। তাঁহাকে তখন অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিব কি করিয়া? তিনি তখন সারা বিশ্বের সহিত এক হইয়া যান; এইরূপ হওয়াই তো চরম লক্ষ্য। হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তাহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিবার সাহস পায় না। নিস্বার্থ কর্মদ্বারা মানব-প্রকৃতির চরম লক্ষ্য এই মুক্তিলাভ করাই কর্মযোগ। সুতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্যই আমাদের সেই লক্ষ্যে

পৌঁছিবার পথে বাধাস্বরূপ, আর প্রত্যেক নিঃস্বার্থ কর্মই আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়। এইজন্য নীতির এই একমাত্র সংজ্ঞাঃ যাহা স্বার্থশূন্য, তাহাই নীতিসঙ্গত; আর যাহা স্বার্থপর, তাহা নীতিবিরুদ্ধ।

খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাপারটি এত সহজ দেখাইবে না। অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একই কার্য এক ক্ষেত্রে স্বার্থশূন্য এবং অপর ক্ষেত্রে সত্যই স্বার্থপ্রণোদিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা কেবল কর্তব্যের একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে পারি; বিশেষ বিশেষ কর্তব্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া নিরূপিত হইবে। এক দেশে একপ্রকার আচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। অপর দেশে আবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার কারণ-পরিবেশ পৃথক্। সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর এই মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা হইতেই লাভ করা হয়। আর প্রত্যেক স্বার্থশূন্য কার্য, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে ঐ আদর্শের অভিমুখে লইয়া যায়; সেইজন্যই ঐ কার্যকে নীতিসঙ্গত বলা হয়। ক্রমশঃ বুঝিবে এই সংজ্ঞাটি সকল ধর্ম এবং সকল নীতেশাস্ত্র-সম্বন্ধেই খাটে। নীতিতত্ত্বের মূলসম্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। কোন কোন প্রণালীতে নীতি কোন উন্নততর পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'মানুষ কেন এ-কাজ করিবে এবং ও-কাজ করিবে না?' উত্তরে ঐ-সকল সম্প্রদায়ের

ব্যক্তিগণ বলিবেন-'ইহাই ঈশ্বরের আদেশ' ! কিন্তু যেখান হইতেই তাঁহারা ইহা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের নীতিতত্ত্বের মূল কথা – 'নিজের' চিন্তা না করা, 'অহং'কে ত্যাগ করা। এই প্রকার উচ্চ নীতিতত্ত্ব সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে ভয় পান। যে ব্যক্তি এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ভাব আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়, তাহাকে বলিতে পারি, এমন এক জনের চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-যাহার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, যে নিজের জন্য কিছু করে না, যে নিজের পক্ষে কোন কথা বলে না; এখন বলো দেখি, তাহার 'নিজত্ব' কোথায়? যতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা করে, কাজ করে বা কথা

বলে, ততক্ষণই সে তাহার 'নিজেকে' বোধ করে। সে যদি কেবল অপরের সম্বন্ধে-জগতের সকলের সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তাহা হইলে তাহার 'নিজত্ব' কোথায়? তাহার 'নিজত্ব' তখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।

অতএব কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রনালী। কর্মযোগীর কোন প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, আত্মা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই হইবে উহার উপলব্ধি, কারণ জ্ঞানী যুক্তিবিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা সমাধান করিতেছেন, তাঁহাকে কোনপ্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্মদ্বারা সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে।

এখন পরবর্তী প্রশ্নঃ এই কর্ম কি? 'জগতের উপকার করা'-রূপ এই ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের কোন উপকার করিতে পারি? উচ্চতম দৃষ্টি হইতে বলিলে বলিতে হইবে, 'না'; কিন্তু আপেক্ষিকভাবে ধরিলে 'হাঁ' বলিতে হইবে। জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার করা যাইতে পারে না; তাহা যদি করা যাইত, তাহা হইলে ইহা আর এই জগৎ থাকিত না। আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারি, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত হইবে। আমরা মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য-আবর্তনশীল সুখ-দুঃখরাশি একেবারে চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে না। জগতে কি কাহাকেও কোন নিত্যসুখ দেওয়া যাইতে পারে? না, তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। সমুদ্রের কোথাও গহ্বর সৃষ্টি না করিয়া একটি তরঙ্গও তুলিতে পারা যায় না। মানুষের প্রয়োজন ও লোভের অনুপাতে জগতে ভালোর সমষ্টি বরাবর একই প্রকার, সর্বদাই সমান। উহা বাড়ানো বা কমানো যায় না। বর্তমানকাল পর্যন্ত পরিজ্ঞাত মনুষ্যজাতির ইতিহাস আলোচনা কর। সেই পূর্বের মতোই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পদমর্যাদার তারতম্য দেখিতে পাই না কি? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ

নম্নপদস্থ; কেহ সুস্থ, কেহ বা অসুস্থ-তাই নয় কি? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ নিম্নপদস্থ; কেহ সুস্থ, কেহ বা অসুস্থ-তাই নয় কি? প্রচীন মিশরবাসী, গ্রীক ও রোমানদের যে-অবস্থা ছিল, আধুনিক আমেরিকানদেরও সেই এক অবস্থা। জগতের ইতিহাস

যতটা জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, মানুষের অবস্থা বরাবর একই প্রকার; তথাপি আবার ইহাও দেখিতে পাই, সুখ-দুঃখের এই দুরপনেয় বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি দূর করিবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগই এমন সহস্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবনের পথ সহজ করিবার জন্য কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন; তাঁহার কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন? আমরা একটি বলকে(ball) একস্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাওয়া-রূপ খেলাই খেলিতে পারি। আমরা শরীর হইতে দুঃখবেদনা দূর করিলাম, উহা মনে আশ্রয় লইল। ইহা ঠিক দান্তের(Dante) সেই নরক-চিত্রের মতো-পাহাড়ের উপর ঠেলিয়া তুলিবার জন্য কৃপণদিগকে রাশীকৃত সুবর্ণ দেওয়া হইয়াছে। যতবার তাহারা একটু ঠেলিয়া তুলিতেছে, ততবারই উহা গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে। সুখের স্বর্ণযুগ (millenium) সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হয়, সে-সবই স্কুলের ছেলেদের উপযোগী সুন্দর গল্প, তদপেক্ষা ভাল কিছু নয়। যে-সকল জাতি এই সুখের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহারা আবার এরূপও ভাবিয়া থাকে যে, ঐ সময়ে তাহারাই সর্বাপেক্ষা সুখে থাকিবে। এই স্বর্ণযুগ-সম্বন্ধে ইহাই বড় অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব!

আমরা এই জগতের সুখ এতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারি না; তেমনি ইহার দুঃখও বাড়াইতে পারি না। এই জগতে প্রকাশিত সুখদুঃখের শক্তিসমষ্টি সর্বদাই সমান। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মাত্র, কিন্তু উহা চিরকালই একরূপ থাকিবে, কারণ এইরূপ থাকাই উহার স্বভাব। এই জোয়ার-ভাঁটা, এই উঠা-নামা জগতের স্বভাবগত। অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করা-'মৃত্যুহীন জীবন সম্ভব' বলার মতোই অযৌক্তিক।

মৃত্যুশূন্য জীবন সম্পর্ণ অর্থহীন। কারণ জীবনের ধারণার মধ্যেই মৃত্যু নিহিত রহিয়াছে, সুখের মধ্যেই দুঃখ নিহিত। এই আলোটি ক্রমাগত পুড়িয়া যাইতেছে, ইহাই উহার জীবন। যদি জীবন চাও তবে ইহার জন্য তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মরিতে হইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিসের দুইটি বিভিন্ন রূপ মাত্র-শুধু বিভিন্ন দিক হইতে উহারা একই তরঙ্গের উত্থান ও পতন এবং দুইটি একত্র করিলে একটি অখন্ড বস্তু হয়। একজন পতনের দিকটা দেখিয়া দুঃখবাদী হন; আর একজন উত্থানের দিকটা দেখেন এবং সুখবাদী হন। বালক যখন বিদ্যালয়ে যায়-পিতামাতা তাহার যত্ন লইতেছেন, তখন বালকের পক্ষে সবই সুখকর মনে হয়। তাহার অভাব খুব সামান্য, সুতরাং সে খুব সুখবাদী। কিন্তু বৃদ্ধ-বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হইবে। এইরূপে প্রাচীন জাতিগুলি-যাহাদের চতুর্দিকে কেবল পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ-তাহারা নূতন জাতিগুলি অপেক্ষা কম আশাশীল। ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে-'হাজার বছর শহর, আবার হাজার বছর বন।' শহরের এই বনে পরিবর্তন এবং বনের শহরে পরিবর্তন সর্বত্র চলিয়াছে। মানুষ এই চিত্রের যখন যে দিকটা দেখে, তখন সে তদনুযায়ী সুখবাদী বা দুঃখবাদী হয়।

এখন আমরা সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। এই স্বর্ণযুগের ধারণা অনেকের পক্ষে কর্ম করিবার শক্তি-প্রচন্ড প্রেরণাশক্তি। অনেক ধর্মেই ধর্মের একটি অঙ্গরূপে প্রচারিত হয়ঃ ঈশ্বর জগৎ শাসন করিতে আসিতেছেন, এবং মানুষের ভিতর আর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে না। যাহারা এই মতবাদ প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া, এবং গোঁড়ারাই সর্বাপেক্ষা অকপট। খ্রীষ্টধর্ম ঠিক এই গোঁড়ামির মোহ দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, ইহারই জন্য গ্রীক ও রোমক ক্রীতদাসগণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল-এই ধর্মে তাহাদিগকে আর দাসত্ব করিতে হইবে না, তাহারা যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবে; সেইজন্যই তাহারা খ্রীষ্টধর্মের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে যাহারা উহা প্রচার করিয়াছিল, তাহারা অবশ্য গোঁড়া অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহারা প্রাণের সহিত ঐসব কথা বিশ্বাস করিত। বর্তমানকালে এই স্বর্ণযুগের আকাঙ্খা-সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাও গোঁড়ামি। যথার্থ সাম্যভাব জগতে কখনও

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কখন হইতেও পারে না। এখানে কি করিয়া আমরা সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলিতে সমষ্টি বিনাশই বুঝায়! জগতের এই যে বর্তমান রূপ, তাহার কারণ কি?-সাম্যের অভাব। জগতের আদিম অবস্থায়-সৃষ্টির পূর্বে সম্পর্ণ সাম্যভাব থাকে। তবে বিশ্বগঠনকারী বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় কিরূপে?-বিরোধ, সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা। মনে কর, পদার্থের পরমাণুগুলি সব সম্পূর্ণ সাম্যবস্থায় আছে, তাহা হইলে কি সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে? বিজ্ঞানের সাহায্যে জানি, ইহা অসম্ভব। জলাশয়ের জল নাড়িয়া দাও, দেখিবে প্রত্যেক জলবিন্দু আবার শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আর একটির দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই একইভাবে-'বিশ্বজগৎ' বলিয়া কথিত এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চ-ইহার অন্তর্গত সকল পদার্থই তাহাদের পূর্ণ সাম্যভাবে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আবার বিক্ষোভ দেখা দেয়, আবার সংযোগ হয়-সৃষ্টি হয়। বৈষম্যই সৃষ্টির ভিত্তি। সৃষ্টির জন্য সাম্যভাব-বিনাশকারী শক্তির যতটা প্রয়াজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকারী শক্তিরও ততটা প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ সাম্যভাব-যাহার অর্থ সর্বস্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির পূর্ন সামঞ্জস্য, তাহা এ-জগতে কখনই হইতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই জগৎ জীব-বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এখানে আর কেহই থাকিবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, এই স্বর্ণযুগ বা পূর্ণ সাম্যভার-সম্বন্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহা নয়, পরন্তু যদি আমরা ঐ ধারণাগুলি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্বয়ই সেই প্রলয়ের দিন ঘনাইয়া আসিবে। মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ কি?-প্রধানতঃ মস্তিষ্কের ভিন্নতা। আজকাল পাগল ছড়া আর কেহই বলিবে না যে, আমরা সকলেই একরূপ মস্তিষ্কের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া আমরা জগতে আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ বা সমান্য হইয়া আসিয়াছি, জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ অতিক্রম করা যায় না। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানগণ সহস্র সহস্র

বৎসর যাবৎ এই দেশে বাস করিতেছিল, আর তোমাদের অতি অল্পসংখ্যক পূর্বপুরুষ এদেশে আসিয়াছিলেন, দেশের চেহারায় তাঁহারা কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। যদি

সকলেই সমান, তবে রেড ইন্ডিয়ানরা নানাপ্রকার উন্নতি এবং নগরাদি নির্মাণ করে নাই কেন? কেনই বা তাহারা চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইল? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারসমষ্টি আসিয়া একযোগে কাজ করিয়া নিজেদের উন্নতি করিয়াছে। আত্যন্তিক বৈষম্যশূন্যতাই মৃত্যু। যতদিন এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্য থাকিবে; সৃষ্টিচক্র যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের স্বর্ণযুগ আসিবে। তাহার পূর্বে সাম্যভাব আসিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমাদের এক প্রবল প্রেরণাশক্তি। সৃষ্টির জন্য যেমন বৈষম্য প্রয়োজন, তেমনি ঐ বৈষম্য সীমাবদ্ধ করার চেষ্টাও প্রয়োজন। বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকিত না, আবার সাম্য বা মুক্তিলাভের ও ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও সৃষ্টি থাকিত না। এই দুই শক্তির তারতম্যেই মানুষের অভিসন্ধিগুলির প্রকৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের এই বিভিন্ন প্রেরণা চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে।

এই সংসার 'চক্রের ভিতরে চক্র'- এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহাতে যদি হাত দিই, তবে আটকা পড়িলেই সর্বনাশ! আমরা সকলেই ভাবি কোন বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই আমরা বিশাম লাভ করিব; কিন্তু ঐ কর্তব্যের কিছুটা করিবার পূর্বেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বিশাল ও জটিল জগৎ-যন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটিমাত্র উপায় আছেঃ একটি-এই যন্ত্রের সহিত সংস্রব একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়া দাঁড়ানো-সকল বাসনা ত্যাগ করা। ইহা বলা খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ অসম্ভব। দুই কোটি লোকের মধ্যে একজন ইহা করিতে পারে কিনা, জানি না। আর একটি উপায়-এই জগতে ঝাঁপ দিয়া কর্মের রহস্য অবগত হওয়া- ইহাকেই 'কর্মযোগ' বলে। জগৎ-যন্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না; উহার ভিতরে থাকিয়া কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাকিয়া যথাযথভাবে কর্ম করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার বাহিরে যাইবার পথ।

আমরা এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ম প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ- কর্মপ্রবাহ সর্বদাই বহিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহারা জানেন-ঈশ্বর এমন একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন। যদিও এই জগৎ চিরকাল চলিতে থাকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য স্বার্থশূন্যতা। কর্মযোগ অনুসারে কর্মের দ্বারাই আমাদিগকে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। এই জন্যই আমাদের কর্মরহস্য জানা প্রয়োজন। জগৎকে সম্পূর্ণরুপে সুখী করিবার যাবতীয় ধারণা গোঁড়াদিগকে কর্মে

প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে ভালই হইতে পারে; কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, গোঁড়ামি দ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মযোগী জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম করিবার জন্য মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রেরণার প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির গন্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়- 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' কর্মযোগী বলেন, মানুষ এ তত্ত্ব অবগত হইয়া অভ্যাস করিতে পারে। যখন লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন আর তাহার বাহিরের কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার কেন করিব?-ভাল লাগে বলিয়া। আর কোন প্রশ্ন করিও না। ভাল কাজ কর, কারণ ভাল কাজ করা ভাল। কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে বলিয়া যে ভাল কাজ করে, সেও নিজের বদ্ধ করিয়া ফেলে। এতটুকু স্বার্থযুক্ত অভিসন্ধি লইয়া যে কর্ম করা যায়, তাহা মুক্তির পরিবর্তে আমাদের পায়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে আমরা স্বর্গ-নামক একটি স্থানে আসক্ত হইব। আমাদেগকে স্বর্গে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হইবে; উহা আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনস্বরূপ হইবে।

অতএব একমাত্র উপায়-সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত হওয়া। এইটি জানিয়া রাখোঃ জগৎ আমরা নয়, আমরাও এই জগৎ নই; বাস্তবিক আমরা শরীরও নই, আমরা প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমরা আত্মা-চিরস্থির, চিরশান্ত। আমরা কোন কিছুর দ্বারা বদ্ধ

হইব? আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই নাই। এমন কি, অপরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কাঁদিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ কান্নাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমরা কল্পনা করি যে, ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাঁদিতেছেন। ঈশ্বর কাঁদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন তো বন্ধনের চিহ্ন-দুর্বলতার চিহ্ন। একবিন্দু চোখের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? 'সম্পূর্ণ অনাসক্ত হও'-বলা খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া যে-কোন ভাল কাজ করি, তাহা আমাদের পায়ে একটি নূতন শৃঙ্খল সৃষ্টি না করিয়া যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি শিকলি ভাঙিয়া দেয়। আমরা প্রতিদানে কিছু পাইবার আশা না করিয়া যে-কোন সৎচিন্তা চারিদিকে প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে-আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটি শিকলি চূর্ণ করিবে, এবং আমরা ক্রমশই পবিত্রতর হইতে থাকিব-যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই। কিন্তু লোকের নিকট ইহা যেন কেমন অস্বাভাবিক ও অত্যধিক দার্শনিক এবং কার্যকর অপেক্ষা বেশী তাত্ত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়াছেন-অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষ কাজ করিতে পারে না।

১। গীতা,২।৪৭

ইহারা গোঁড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন 'নিঃস্বার্থ' কার্য কখন দেখে নাই, সেইজন্যই এইরূপ বলিয়া থাকে।

উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব; একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ এই একটি ব্যক্তি ছাড়া জগতের মহাপুরুষগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ এক শ্রেণী বলেন-তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন-তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ; উভয়েরই কার্যের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আসে;

আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জগৎ হইতেই পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।'

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত-অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এত উর্ধ্বে উঠিয়াছেন! সমুদয় মনুষ্যজাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র উদ্ভূত হইয়াছে, যেখানে এত উন্নত দর্শন ও এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান্ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহানুভুতি প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী-সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে-যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করিয়াছে, তিনিই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ-অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত! জগতে তিনিই প্রথম একজন মহান্ সংস্কারক। তিনিই প্রথম সাহসপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'কোন প্রাচীন পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যকাল হইতে তোমাকে বিশ্বাস করিতে শেখানো হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না; বিচার করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ-উহা সকলের পক্ষে উপকারী, তবেই উহা বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর।'

যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত।